Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ সুমাইয়া ইয়াসমিন

রোলঃ 227020971

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

তাকওয়া

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছা: সুমাইয়া ইয়াসমিন

রোলঃ 227020971

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " তাকওয়া " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছা: সুমাইয়া ইয়াসমিন, আইডিঃ 227020971 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " তাকওয়া " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sumaiya

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

মোছা: সুমাইয়া ইয়াসমিন

আইডিঃ 227020971

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

তাকওয়া 5

তাকওয়া অর্থ 5

তাকওয়ার গভীর অর্থ: 7

তাকওয়ার গুরুত্ব: 8

তাকওয়ার দুই স্তর, মুত্তাকীর দুই শ্রেণী 13

তাকওয়া সম্পর্কিত ঘটনা 20

আল্লাহর ভয় 23

কোরআনে যেভাবে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে 24

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১০২) 24

তাকওয়া অর্জনের উপায় 28

মুত্তাকী 31

মুত্তাকীদের ৫ টি বৈশিষ্ট্যঃ 33

তাকওয়ার স্তর 34

মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে তাকওয়া ও মুত্তাকী 38

উপসংহার: 40

Reference 41

তাকওয়া

তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি মুমিন জীবনের মূলভিত্তি। যে ব্যক্তি আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে আল্লাহ তার সকল বিষয় সমাধান করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ- ‘যে আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং এমন সূত্রে তাকে রিযিক দেন যার কল্পনা সে করেনি’ *(তালাক ২-৩)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যেরূপ ভয় করা উচিৎ। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ কর না’ *(আলে ইমরান ১০২)*।

তাকওয়া অর্থ

তাকওয়া (আরবি: تقوى) শব্দের অর্থ বিরত থাকা, বেঁচে থাকা, নিষ্কৃতি লাভ করা, ভয় করা, নিজেকে রক্ষা করা। ব্যবহারিক অর্থে: *দ্বীনদারি, ধার্মিকতা, পরহেজগারি, আল্লাহভীতি, আত্মশুদ্ধি , আল্লাহ ও সত্যের প্রতি সচেতন এবং পরিজ্ঞাত হওয়া, "ধর্মপরায়ণতা, আল্লাহর ভয়"* ইত্যাদি বোঝায়।

ইসলামি পরিভাষায়,

সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে হারাম থেকে বেঁচে থাকা এবং তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলাই হল তাকওয়া।[1] অন্যকথায় সকল প্রকার হারাম থেকে নিজেকে রক্ষা করে কুরআন সুন্নাহ মোতাবেক জীবন পরিচালনা করাকে তাকওয়া বলা হয়।

এটি প্রায়শই কুরআনে পাওয়া যায়। যারা তাকওয়া অনুশীলন করে — ইবনে আব্বাসের ভাষায়, "আল্লাহর সাথে শিরক পরিহার করে এবং তাঁর আনুগত্যে কাজ করে এমন বিশ্বাসী"- তাদের বলা হয় *মুত্তাকি* (আরবি: مُتَّقِينَ, আল-মুত্তাকিন, ধার্মিক) বা *তাক্বী* (আরবি: تقي)।

তাকওয়া" শব্দটি ওয়াকা (আরবি: وقى) ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যার আক্ষরিক অর্থ আত্মরক্ষা, সংরক্ষণ, সুরক্ষা, ঢাল ইত্যাদি। আরবি শব্দ তাকওয়া মানে "সহনশীলতা, ভয় এবং বিরত থাকা। সূরা লাইল এর ৮ নং আয়াত অনুযায়ী তাকওয়ার বিপরীত হলো ইস্তিগনাহ (আরবি: اسْتِغْنَاء), এটি আরবি ক্রিয়ামূল গনী (আরবি: غَنِيٌّ) থেকে এসেছে, যার অর্থ অভাবমুক্ত হওয়া, সুতরাং ইস্তিগনাহর যে সকল অর্থ হতে পারে বা যে সকল আভিধানিক অর্থ পাওয়া গিয়েছে সে অনুযায়ী এর ইসলামী অর্থ হলো আল্লাহর সীমা

থেকে মুক্ত হওয়া, বেপরোয়া আচরণ করা, বাড়াবাড়ি করা, সীমালঙ্ঘন করা, দুঃসাহস দেখানো, দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা ইত্যাদি।

ইসলামিক উৎস থেকে শব্দটির কিছু বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত:

- "আল্লাহর চেতনা... ধার্মিকতা, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর প্রতি ভালবাসা এবং আত্মসংযম"।
- "আল্লাহর-চেতনা বা খোদাভীরু তাকওয়া", "পুণ্য", "সতর্কতা"।
- আল্লাহর ভয়, "সতর্ক থাকা, পরকালে নিজ স্থান জেনে রাখা"। তাকওয়ার "প্রমাণ" হল আল্লাহর "ভয় পাওয়ার অভিজ্ঞতা", যা "একজন ব্যক্তিকে অন্যায় কাজ থেকে সতর্ক থাকতে অনুপ্রাণিত করে" এবং আল্লাহকে খুশি করে এমন কাজ করতে আগ্রহী করে।
- আক্ষরিক অর্থে "রক্ষা করা"। সাধারণভাবে, নিজেকে "আল্লাহর ক্রোধ থেকে" রক্ষা করার জন্য "আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তাতে লিপ্ত না হওয়া"।
- "হৃদয়ের একটি উচ্চ অবস্থা, যা একজনকে আল্লাহর উপস্থিতি এবং তাঁর জ্ঞান সম্পর্কে সচেতন রাখে।" তাকওয়া সেই ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে যে এটি "সৎ কাজ করতে" এবং নিষিদ্ধ কাজগুলি এড়িয়ে চলতে নিজের মাঝে ধারণ করে।
- এরিক ওহল্যান্ডারের মতে, কুরআনিক আরবীতে, তাকওয়া বলতে বোঝায় আল্লাহর অসন্তুষ্ট করা থেকে নিজেকে রক্ষা করার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহকে ভয় করা।
- (আল্লাহর দেওয়া) নিরাপদ সীমার ভেতরে থেকে নিজেকে রক্ষা করা।
- মতে তাকওয়ার মূল অর্থ হল কোনটি আল্লাহ অপছন্দ করেন তা এড়ানো। উমর বিন খাত্তাব, উবাই ইবনে কাবকে তাকওয়ার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি জবাবে বললেন, "আপনি কি কখনো এমন পথে হেঁটেছেন যেখানে কাঁটা বিছানো রয়েছে?" উমর বললেন, হ্যাঁ। উবাই জিজ্ঞাসা করলেন, "তখন আপনি কি করেছেন?" এর উত্তরে উমর বললেন, আমি অনেক সচেতনতার সাথে পথ চলেছি যাতে কাঁটা থেকে নিরাপদে থাকা যায় ।" উবাই বলেন, "এটিই তাকওয়া, জীবনের বিপজ্জনক যাত্রার মধ্য দিয়ে নিজেকে পাপ থেকে রক্ষা করা, যাতে পাপের দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে সবসময় সতর্কতার সাথে থেকে যাত্রা সফলভাবে শেষ করা যায়"।

- ওমর বিন আবদুল আজিজ বলেন, "দিনে রোজা রাখা বা রাত জেগে ইবাদত করার নাম তাকওয়া নয়; বরং তাকওয়া হলো আল্লাহ যা ফরজ করেছেন তা মানা এবং যা হারাম করেছেন তা থেকে দূরে থাকা।"
- ইবনে তাইমিয়া বলেন, "তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহ যা আদেশ করেছেন তা প্রতিপালন করা এবং যা নিষেধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করা।"
- জারুল্লাহ যামাখশারী বলেন, “ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় মুত্তাকী হল ঐ ব্যক্তি, যে নিজ সত্তাকে রক্ষা করে এমন বিষয় থেকে, যার জন্য সে শাস্তির উপযোগী হয়ে যায়; সেটি করণীয় হোক বা বর্জনীয়।"
- *ফিকহ* (ইসলামী আইনশাস্ত্র) এর কমপক্ষে একটি জনপ্রিয় রচনায় "কিতাবুত তাকওয়া বা তাকওয়ার বই", যা হারাম (নিষিদ্ধ) বিষয় সম্পর্কে নিষেধ করেছে, মাকরুহ (নিরুৎসাহিত) এবং "ইসলামের স্তম্ভগুলি" এর বাইরে বিষয়গুলিও নিষিদ্ধ হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: খাবার, পোশাক, যৌনতার সাথে সম্পর্কিত জিনিসগুলি ("ব্যক্তিগত বিষয়গুলি"), সংগীত, পরনিন্দা, খারাপ কথা, খারাপ সঙ্গ, দাড়ি ছাঁটাই ইত্যাদি।

তাকওয়ার গভীর অর্থ:

* আল্লাহকে সর্বদা মনে রাখা: তাকওয়া মানে হল আল্লাহকে সর্বদা স্মরণ করা, তাঁর উপর ভরসা রাখা এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করা।
* হারাম থেকে দূরে থাকা: আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, সেসব কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখাই হল তাকওয়া।
* হালাল উপার্জন: আল্লাহ যা হালাল করেছেন, সেই পথে উপার্জন করা এবং হালাল খাবার খাওয়াই হল তাকওয়া।
* সত্যবাদিতা ও আমানতদারি: সত্য কথা বলা এবং আমানত রক্ষা করাও তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত।
* সৎকর্ম করা: আল্লাহ যা পছন্দ করেন, সেসব কাজ করা এবং অন্যদের উপকার করাও তাকওয়া।

তাকওয়ার গুরুত্ব:

তাকওয়া হল মুমিনের জন্য সবচেয়ে বড় সম্পদ। তাকওয়ার মাধ্যমে মানুষ জান্নাত লাভ করতে পারে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিরাপদ থাকতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ- 'আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দন্ডায়মান হতে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত' *(আর-রহমান ৪৬)*।

তাক্বওয়া মুমিনের একমাত্র সম্বল। যা মানুষকে সম্মানিত করে। তাক্বওয়াশীলদেরকেই আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (ছাঃ) সবচেয়ে সম্মানিত বলেছেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ-

'হে মানুষ সকল! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী হতে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানি সে, যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন এবং সব বিষয়ে অবহিত' *(হুজুরাত ১৩)*। এখানে আল্লাহ তা'আলা পরহেযগার মানুষকেই সবচেয়ে বড় সম্মানিত মানুষ বলে উল্লেখ করেছেন। অত্র আয়াতে একথাও বলা হয়েছে যে, বংশ মর্যাদা সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয় এবং নারী বা পুরুষ হয়ে জন্ম নেয়াও সম্মানিত হওয়ার মাধ্যম নয়। মানুষ কেবল তাকওয়ার ভিত্তিতে ইহাকাল ও পরকালে সম্মান লাভ করতে পারে।

আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন, فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ 'তোমরা আল্লাহকে যথা সম্ভব ভয় কর' *(তাগাবুন ১৬)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ মানুষকে তার সাধ্য অনুযায়ী পরহেযগারিতা অবলম্বন করার জন্য আদেশ করেছেন।

অন্যত্র তিনি আরো বলেন, يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল' *(আহযাব ৭০)*। এ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে পরহেযগারিতা অবলম্বন করতে বলেন এবং সত্য কথা বলতে আদেশ করেন। অপর এক আয়াতে পরহেযগারিতা অবলম্বনের উপকারিতা তুলে ধরে আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে চল, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার মানদন্ড দান করবেন। তোমাদের পাপ

মিটিয়ে দিবেন। আর তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। কারণ আল্লাহ বড় অনুগ্রহশীল' *(আনফাল ২৯)*।

অত্র আয়াতে চারটি জিনিসের কথা বলেছেন- (১) পরহেযগার হতে বলেছেন (২) বিনিময়ে আল্লাহ মানদন্ড দিবেন (৩) পাপ মিটিয়ে দিবেন (৪) ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহভীতি বা তাকওয়া মানুষকে ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করে চলার মানসিকতা তৈরী করে দেয়। আর তাকওয়া মানুষের জীবিকার গ্যারান্টি হতে পারে।

মানুষ তার বংশ মর্যাদা দ্বারা সম্মান লাভ করতে পারে না। কেবল তাক্বওয়া দ্বারা ইয্যত-সম্মান লাভ করতে পারে।

আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 'যে লোক আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার কাজ সহজ ও সুবিধাজনক করে দেন' *(তালাক্ব ৪)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ বলেন, যারা পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 'যে লোক পরহেযগারিতা অবলম্বন করে আল্লাহ তার পাপ মিটিয়ে দেন এবং তাকে বড় প্রতিদান প্রদান করেন' *(তালাক্ব ৫)*। অত্র আয়াতে তাকওয়া অবলম্বন করার দু'টি বড় ফলাফলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (১) তাকওয়ার ভিত্তিতে আল্লাহ মানুষের পাপ মিটিয়ে দেন। (২) আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারীকে বড় প্রতিদান দেন। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ- 'আর তোমরা পাথেয় সংগ্রহ কর। আর নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় হচ্ছে তাক্বওয়া। হে জ্ঞানী মানুষ! তোমরা আমাকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ১৯৭)*। অত্র আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাক্বওয়াকে সবচেয়ে উত্তম পাথেয় বলেছেন। আর আল্লাহ জ্ঞানী ব্যক্তিকে সম্বোধন করে বলেন, তোমরা আমার ব্যাপারে তাক্বওয়া অবলম্বন কর। অন্যত্র তিনি বলেন, وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ 'আর জেনে রেখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাক্বওয়াশীল মানুষের সাথে থাকেন' *(বাক্বারাহ ১৯৪)*। আল্লাহ অন্যত্র বলেন, فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাকওয়াশীল ব্যক্তিদের ভালবাসেন' *(আলে ইমরান ৭৬)*। উপরোক্ত আয়াত সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুখে-শান্তিতে ও নিরাপদে জীবন যাপন করার জন্য তাকওয়াই হচ্ছে বড় মাধ্যম।

এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ أَتْقَاهُمْ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূল (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, মানুষের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাবান ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, যে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে আল্লাহভীরু' *(বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন হা/৬৯)*।

এজন্য রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ 'যার কর্ম তাকে পিছে সরিয়েছে, তার বংশ মর্যাদা তাকে আগে বাড়াতে পারবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪)*।

নবী কারীম (ছাঃ) যুদ্ধের প্রধান সেনাপতিকে তাকওয়াশীল হওয়ার জন্য আদেশ করতেন-

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِيْ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِيْنَ خَيْرًا-

সুলায়মান ইবনে বুরায়দা (রাঃ) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন তার পিতা বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন সৈন্যদলের আমীর নির্ধারণ করতেন, তখন তাকে বিশেষভাবে আল্লাহকে ভয় করার তথা তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য আদেশ করতেন। আর সাধারণ মুসলিম যোদ্ধাদেরকে কল্যাণের উপদেশ দিতেন' *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১২৬৮*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ فَقَالَ تَقْوَى اللهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، أَتَدْرُوْنَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ الْفَمُ وَالْفَرْجُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন তোমরা কি জান কোন জিনিস মানুষকে সবচেয়ে বেশী জান্নাতে প্রবেশ করায়? তা হচ্ছে আল্লাহর ভয় বা তাক্বওয়া ও উত্তম চরিত্র। তোমরা কি জান মানুষকে সবচেয়ে বেশী জাহান্নামে প্রবেশ করায় কোন জিনিস? একটি মুখমণ্ডল ও অপরটি লজ্জাস্থান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৬২১, হাদীছ ছহীহ)*। অত্র হাদীছে আদর্শ পুরুষের চারটি গুণ তুলে ধরা হয়েছে। (১) তাকওয়া বা আল্লাহভীতি (২) উত্তম চরিত্র (৩) মুখ নিয়ন্ত্রণ (৪) লজ্জাস্থানের হেফাযত। এসব বিষয় কেউ অবলম্বন করতে পারলে সে আদর্শ মানুষ হয়ে গড়ে উঠবে। তার দ্বারা দেশ ও সমাজ উপকৃত হবে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হলে এবং সবাই তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হলে তাদের দ্বারা অন্যরা নির্যাতিত হবে না। সবাই শান্তি-নিরাপত্তা লাভ করবে এবং তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি হবে জান্নাতী।

عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى-

হাসান বাছারী সামুরা ইবনু জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'মান-মর্যাদা হল ধন-সম্পদ। আর ভদ্রতা-নম্রতা হল তাক্বওয়া অবলম্বন করা' *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৬৮৮)*। মানুষ কিভাবে ভদ্র-নম্র হতে পারে এ হাদীছে তার স্পষ্ট বিবরণ পেশ করা হয়েছে। পরহেযগারিতা ছাড়া মানুষ ভদ্র হতে পারে না। আর পরহেযগার মানুষ ছাড়া অন্য কাউকে ভদ্র বলা যায় না। মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে তাকে বিচার করা যায় না। প্রকৃত পক্ষে তাকওয়াই মানুষকে শালীন-ভদ্র করে গড়ে তোলে।

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَنْسَابَكُمْ هَذِهِ لَيْسَتْ بِمُسَبَّةٍ عَلَى أَحَدٍ كُلُّكُمْ بَنِيْ آدَمَ طَفُّ الصَّاعِ بِالصَّاعِ لَمْ تَمْلَئُوهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ فَضْلٌ إِلَّا بِالدِّينِ وَالتَّقْوَى كَفَى بِالرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ بَذِيًّا فَاحِشًا بَخِيلاً-

উক্কবা ইবনু আমের (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘তোমাদের বংশ পরিচয় এমন কোন বস্তু নয় যে, তার কারণে তোমরা অন্যকে গালমন্দ করবে। তোমরা সকলেই আদমের সন্তান। দাড়িপাল্লার উভয় দিক যেমন সমান থাকে, যখন তোমরা পূর্ণ করনি। দ্বীন ও তাক্বওয়া ছাড়া একজনের উপর আর একজনের কোন মর্যাদা নেই। তবে কোন ব্যক্তির মন্দ হওয়ার জন্য অশ্লীল বাকচারী ও কৃপণ হওয়াই যথেষ্ট’ *(আহমাদ, মিশকাত হা/৪৬৯৩)*। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল যে, বংশের নিন্দা করা যাবে না। আর পাল্লার উভয় দিক যেমন সমান, তেমনি আদম সন্তান হিসাবে সকল বংশের মানুষই সমান। সুতরাং একমাত্র তাক্বওয়াই হল উচু-নীচু মান নির্ধারণের মাধ্যম। এ হাদীছে উল্লেখিত দু’টি দোষ মানুষের অভদ্র হওয়ার মাধ্যম। (১) অশ্লীল বাকচারী (২) কৃপণ। যাকে তাকে যখন তখন যথেচ্ছা গালিগালাজ করা, অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা অভদ্রতা। এগুলি পরিহার করা যেমন প্রত্যেক মুমিনের জন্য অবশ্য কর্তব্য, তেমনি কৃপণতা ত্যাগ করা অবশ্য কর্তব্য।

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ-

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছেন, ‘ঈমানদার ছাড়া কাউকে সাথী কর না। আর পরহেযগার ব্যতীত কেউ যেন তোমার খাদ্য না খায়’ *(তিরমিযী, আবু দাঊদ, মিশকাত হা/৪৭৯৮)*। অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ঈমানদার ব্যক্তি ছাড়া কাউকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করা যাবে না। আর পরহেযগার ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে স্বেচ্ছায় খাদ্য দেয়া যাবে না। তবে পরহেযগার ছাড়া কেউ যদি চায় তাহলে তাকে সাধ্যমত দান করতে হবে। আল্লাহর বাণী, ‘আপনি সায়েলকে ধমক দিবেন না’ *(যুহা ১০)*।

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا-

আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেছেন, ‘তুমি যেখানে যেভাবে থাকবে আল্লাহকে ভয় করবে বা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে। কোন কারণ বশত পাপ কাজ হয়ে গেলে তারপর ভাল কাজ করবে। তা তোমার পাপকে মিটিয়ে দিবে’ *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০৮৩)*।

অত্র হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ যেখানে যেভাবেই থাকবে সেখানে সে অবস্থাতেই পরহেযগারিতা অবলম্বন করবে। আর যে কোন অপছন্দনীয় কথা ও কাজের পর পুণ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " ثَلَاثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ: فَتَقْوَى اللهِ فِي السِّرِّ والعلانيةِ والقولُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَى وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَى وَالْفَقْرِ. وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তিনটি কাজ মানুষকে রক্ষা করে এবং তিনটি কাজ মানুষকে ধ্বংস করে। রক্ষাকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা (২) সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টিতে হক কথা বলা এবং (৩) সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী কাজ তিনটি হচ্ছে- (১) প্রবৃত্তির অনুসরণ করা (২) কৃপণতাকে মেনে নেওয়া এবং (৩) আত্ম-অহংকার করা। আর এটিই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫১২২)*।

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ، وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ، وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ، إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

হে মানুষ! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রতিপালক একজন এবং তোমাদের পিতা একজন। মনে রেখো, আরাবীদের কোন সম্মান নেই আজামীদের উপর এবং আজামীদের কোন সম্মান নেই আরাবীদের উপর। লাল রংয়ের লোকের কোন সম্মান নেই কালো রংয়ের লোকের উপর এবং কালো রংয়ের লোকের কোন সম্মান নেই লাল রংয়ের লোকের উপর। তবে তাক্বওয়াই হচ্ছে মর্যাদার মাধ্যম। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী সেই, যে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে তাক্বওয়াশীল *(সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭০০)*।

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সহজ-সরল সঠিক পথ চাই। তোমার নিকট পরহেযগারিতা চাই। হারাম হতে বেঁচে থাকতে চাই এবং অন্যের নিকট মুখাপেক্ষী হওয়া হতে বেঁচে থাকতে চাই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৭০)*। অত্র হাদীছ দ্বারা বুঝা গেল নবী করীম (ছাঃ) সর্বদা আল্লাহর নিকট পরহেযগারিতা চাইতেন।

1. হাদীসে এসেছে: { إن في الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورها، وظهورها من بطونها } فقال أعرابي: لمن هذا يا رسول الله؟ قال: { لمن أطاب الكلام، وأطعم الطعام، وصلّى بالليل والناس نيام }. "নিশ্চয় জান্নাতের মধ্যে এমন কিছু প্রাসাদ

রয়েছে, যার অভ্যন্তর বাহির থেকে দেখা যাবে এবং বাহির ভেতর থেকে দেখা যাবে। এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা করল: হে আল্লাহর রাসূল, এ প্রাসাদগুলো কার জন্যে হবে ? তিনি বললেন: "যে সুন্দর কথা বলবে, খানা খাওয়াবে ও মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকবে, তখন সে সালাত পড়বে।

2. ↑ হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: { إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن }. "তোমরা যখন আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে, তখন জান্নাতুল ফেরদাউসের প্রার্থনা করবে। কারণ এটা মধ্যবর্তী ও সর্বোচ্চ জান্নাত, সেখান থেকে নহরসমূহ প্রবাহিত। তার উপরে রয়েছে আল্লাহর আরশ।

তাকওয়ার দুই স্তর, মুত্তাকীর দুই শ্রেণী

পাপ-পুণ্য মানব-জীবনের এক সাধারণ অনুষঙ্গ। মানুষের মাঝে পাপীও আছে, পুণ্যবানও আছে। তবে অধিকাংশ মানুষের পরিচয় এই যে তাদের আমলনামা পাপ-পুণ্যে মিশ্রিত। অতএব এ বিষয়েও পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

কুরআন মাজীদ এ বিষয়ে আমাদের সঠিক ধারণা প্রদান করে। এটি কুরআন মাজীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু। এ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকলে মানুষ নানা ধরনের বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির শিকার হয় যা তার কর্ম ও আচরণকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মাঝে এ বিষয়ে বহু ভ্রান্তি ও প্রান্তিক ধারণাও ছিল, এখনও আছে। কিছু মুসলিম ফেরকা ও উপদল, যেগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআর বাইরে, তাদেরও নানা বিভ্রান্তি আছে। এ সকল বিভ্রান্তিই কুরআনের বর্ণনা দ্বারা ভ্রান্তি ও বিচ্যুতি হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু এ সকল দিক আমাদের এ দরসের বিষয়বস্তু নয়। সাধারণ মানুষের সাধারণ কিছু ভুল ধারণার উপর আলোকপাত করাই আজকের আলোচনার উদ্দেশ্য।

সূরা আ'রাফে(৭ : ২০১-২০২) আল্লাহ তাআলা বলেন-

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ . وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

আল্লাহ তাআলা এ দুই আয়াতে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য ও 'ইখওয়ানুশ শায়াতীন'-এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। অন্য ভাষায় বলা যায়, 'ইবাদুর রাহমান' ও 'ইবাদুশ শাইতান' তথা আল্লাহর বান্দা ও শয়তানের বান্দাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। এ দুই আয়াত আমাদের জন্যে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের মতো গোনাহগার, যারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে যাই, গোনাহে লিপ্ত হয়ে

যাই- এই সকল মানুষের জন্য এ দুই আয়াতে যেমন আছে গভীর সান্ত্বনা, তেমনি আছে অতি প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ।

আল্লাহ পাক হলেন রাহমানুর রাহীম। অতি দয়ালু, পরম করুণাময়। দয়া ও করুণার কারণে তিনি কুরআন মাজীদে এমন সব বিবরণ, এমন সব নির্দেশনা ও উপস্থাপনা রেখেছেন যার উপলব্ধি অর্জিত হলে কোনো কিছুই বান্দাকে আল্লাহ পাকের সামনে সমর্পিত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

এই দুই আয়াতে বলা হয়েছে, নিশ্চয়ই যারা আল্লাহকে ভয় করে যখন তাদেরকে স্পর্শ করে শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কিছু; কুমন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা, তখন তারা স্মরণ করে; আল্লাহকে স্মরণ করে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ স্মরণ করে। ফলে তাদের চোখ খুলে যায়, করণীয় স্পষ্ট হয়ে যায়। এ হচ্ছে মুত্তাকীদের বৈশিষ্ট্য।

মুত্তাকী মানে কী? মুত্তাকী মানে কি মাসুম বা নিস্পাপ? না। মাসুম বা নিস্পাপ তো ছিলেন নবী রাসূলগণ। আল্লাহ যাদের তৈরিই করেছেন এমনভাবে যেন তাঁরা গোটা মানবজাতির জন্যে আদর্শ হতে পারেন। তাঁরাই যদি গোনাহে লিপ্ত হতেন (নাউযুবিল্লাহ) তাহলে তো মানুষ আরো বেশি গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তো মাসুম হওয়া নবী-রাসূলের বৈশিষ্ট্য। তেমনি তা ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্য। ফিরিশতাদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে বলেছেন-

لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের কোনো আদেশ অমান্য করেন না। আর আল্লাহ পাক তাদের যে আদেশ করেন তা পালন করেন । -সূরা তাহরীম ৬৬ : ৬

মুত্তাকী হলেন আল্লাহ পাকের ঐসকল বান্দা, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে এবং যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। আল্লাহকে স্মরণ করার এক পর্যায় হল, গুনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

‘পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।’-সূরা নাযিআত ৭৯ : ৪০-৪১

গুনাহের পরিস্থিতি অনেক রকম হতে পারে। যেমন ক্রোধের পরিস্থিতি। কারো প্রতি ক্রোধ জাগ্রত হয়েছে, এ অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে মুত্তাকী হিসাবে গণ্য হয়। বিখ্যাত তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ রাহ. আলোচিত আয়াতের طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ ‘শয়তানের পক্ষ হতে কুমন্ত্রণাকে’ ‘ক্রোধ’ শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। এটি একটি ক্ষেত্র। এ রকম আরো অনেক ক্ষেত্র হতে পারে। অন্যান্য গুনাহের পরিস্থিতিতেও আল্লাহর ভয়ে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা ‘তাকওয়ার’ পরিচয় পাওয়া যাবে।

এক্ষেত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আববাস রা.-এর শব্দটি ব্যাপক। তিনি طائف من الشيطان-এর ব্যাখ্যা করেছেন اللمة من الشيطان অর্থাৎ 'শয়তানের প্ররোচনা'।

মোটকথা গুনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গুনাহ ত্যাগ করা তাকওয়ার একটি প্রকার। এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার কাছে মুত্তাকী হিসাবে গণ্য।

আল্লাহকে স্মরণ করার দ্বিতীয় পর্যায় হল গুনাহ হয়ে যাওয়ার পর স্মরণ করা। মুত্তাকী বান্দার কখনো কোনো গোনাহ হয় না, তা নয়। স্খলন হতে পারে, ভুল হতে পারে, কিন্তু তার বৈশিষ্ট্য হল, গুনাহ হয়ে গেলে মনে অনুতাপ জাগে, আল্লাহর ভয় জাগে এবং এই উপলব্ধি জাগে যে, আমি আমার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছি। আর তখন সে তার করণীয় স্পষ্ট দেখতে পায় যে, আমাকে এই অবস্থা থেকে ফিরতে হবেই। সে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়। এটিও তাকওয়ার একটি সত্মর এবং মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এদের সম্পর্কেও আছে জান্নাতের সুসংবাদ। সূরা আলে ইমরানে, যেখানে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন, সেখানে আছে-

اَلَّذِيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'এবং যারা কোনো অশ্লীল কাজ করে ফেললে অথবা নিজেদের প্রতি জুলুম করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ ছাড়া কে পাপ ক্ষমা করবে? আর তারা যা করে ফেলে জেনে বুঝে তাতে অটল থাকে না।' -সূরা আলে ইমরান : ৩ : ১৩৫

তো এ আয়াতে তাকওয়ার এ পর্যায়টির কথা পাওয়া যায়। আমাদের আলোচ্য আয়াত এ পর্যায়কেও শামিল করে। ইমাম সুদ্দী রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি ঐ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন, إذا زلوا تابوا অর্থাৎ যখন তাদের পদস্খলন ঘটে তখন তওবা করে।

জামে তিরমিযীতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. থেকে হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন,

- سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا , ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة... وهم يعلمون ...

আমি আল্লাহর রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে কেউ যখন কোনো গুনাহ করে ফেলে এরপর (তার বোধোদয় হয় এবং সে) উত্তমরূপে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর নামায পড়ে, এরপর আল্লাহর কাছে মাফ চায়, আল্লাহ তাকে মাফ করে দেন। এরপর তিনি এ আয়াত তিলাওয়াত করেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৪০৬

যখন কোনো বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরতে শুরু করে তখন আল্লাহ কত খুশি হন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো মরুভূমিতে সফর করছে। যে উটে সফর করছে তাতেই তার পাথেয় ও সামানা। কোথাও হয়ত যাত্রা বিরতির জন্য একটু নেমেছে। এদিকে সুযোগ পেয়ে উটটি পালিয়ে গেল। এখন এই ধূ ধূ মরুভূমিতে মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই প্রান্তর পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, আর পানি ও পাথেয় ছাড়া বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। অতএব মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এক গাছের নিচে এসে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখে, তার সেই উট সব পাথেয়সহ তার সামনে উপস্থিত। আনন্দের আতিশয্যে ভুলে বলে ফেলেছে اللهم أنت عبدي وأنا ربك (হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব!) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ বান্দা ঐ মুহূর্তে তার উট ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ আনন্দিত হয়, আল্লাহ পাক তার ফিরে আসা বান্দার প্রতি তারচেয়েও বেশি খুশি হন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৪৬

আল্লাহ পাকের কি আনন্দিত হওয়ার কোনো দরকার আছে? এই বান্দা যদি তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে তাতে কি আল্লাহ পাকের কোনো লাভ আছে? তাতে কি আল্লাহ পাকের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব বেড়ে যাবে? আল্লাহ পাকের রাজত্ব বেড়ে যাবে? কিছুই হবে না। এটা হল আল্লাহ পাকের রহম ও করমের প্রকাশ, তাঁর দয়া ও করুণার প্রকাশ যে, তাঁর কোনো বান্দা তওবা করে ফিরে এলে তিনি খুশি হন। সহীহ মুসলিমের আরেক হাদীসে আছে -

إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها

আল্লাহ পাক রাতের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন দিনের অপরাধী তাঁর দিকে ফিরে আসে। আবার দিনের বেলা তাঁর হাত প্রসারিত করেন যেন রাতের অপরাধী তাঁর দিকে ফিরে আসে। এবং এভাবে সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া- অর্থাৎ কিয়ামতের আগ পর্যন্ত আল্লাহ পাক তাঁর গোনাহগার বান্দাদের জন্য তাঁর দয়া ও করুণা প্রসারিত রাখেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৫৯

তো মুত্তাকী ও পরহেযগার বান্দা তারাই যাদের অন্তরে শয়তান যখন কোনো কুমন্ত্রণা দেয় তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং গোনাহ থেকে বিরত থাকে। কিংবা কখনো গুনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে।

পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই-বেরাদার তাদের অবস্থা কী? তাদের অবস্থা হল-

وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ

শয়তান তাদেরকে গোমরাহীর পথে মদদ দিতে থাকে এবং এগিয়ে নিতে থাকে। আর এবিষয়ে কোন ত্রুটি করে না। ফলে ওরা চূড়ান্ত গোমরাহীতে গিয়ে নিপতিত হয়। এরপর সে

অবস্থায়ই তাদের মৃত্যু হয়। আর আল্লাহ তাআলার সামনে তারা শয়তানের ভাই হিসাবেই উপস্থিত হয়। তো আল্লাহ পাকের কোনো বান্দা যদি তাঁর সামনে তাঁর সবচে' বড় অবাধ্য-শয়তানের দোসর হিসাবে উপস্থিত হয় তার পরিণাম কী হবে?! তার পরিণাম তো অত্যন্ত ভয়াবহ। এজন্য গোনাহর চিন্তা মনে এলেই আল্লাহর আশ্রয় নেয়া উচিত। আর কখনো গোনাহ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে ভাবা উচিত যে, আমি ভুল পথে আছি। এই পথ আমাকে দুনিয়াতে লাঞ্ছিত করবে। এই পথ আমাকে আখেরাতে ধ্বংস করবে। এই পথ আমার সুনাম-সুখ্যাতি মান-মর্যাদা সব ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। এইভাবে চিন্তা করা উচিত। যখন মানুষ এইভাবে চিন্তা করে তখন তার ফিরে আসা সহজ হয়ে যায়।

তওবা কাকে বলে? আলিমগণ কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তওবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এভাবে যে, কারো যখন গোনাহ হয়ে যাবে সঙ্গে সঙ্গে সেই গোনাহ পরিত্যাগ করবে। সেই গোনাহর জন্যে অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করবে। আর সেই গোনাহর ক্ষতিপূরণের কোনো বিধান যদি শরীয়তে থাকে তাহলে তা পালন করবে। যেমন কারো নামায কাযা হয়ে গেছে। ইচ্ছাকৃতভাবে অনেকদিন নামায পরিত্যাগ করেছে। তাহলে তাকে সেই নামাযগুলোও কাযা করতে হবে। এমনিভাবে কেউ যদি কারো কাছ থেকে অন্যায়ভাবে সম্পদ নিয়ে থাকে। ছিনতাই বা আত্মসাৎ করে থাকে, তাহলে তার তওবা শুধু এটুকুই নয় যে, সে অনুতপ্ত হবে এবং ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করবে; বরং তাকে সেই লুণ্ঠিত বা আত্মসাৎকৃত সম্পদও ফিরিয়ে দিতে হবে। সুতরাং তওবা পূর্ণ হয় তিন কাজের দ্বারা : **এক.** অনুতপ্ত হওয়া। **দুই.** গোনাহ ছেড়ে দেওয়া ও ভবিষ্যতে না করার সংকল্প করা। **তিন.** ক্ষতিপূরণের যে বিধান ইসলামী শরীয়তে আছে তা পালন করা। এই তিন কাজ যখন হয় তখন তওবা পূর্ণ হয়। তখন আল্লাহ পাক ঐ বান্দাকে কবুল করেন।

কুরআন মাজীদের ফরমান, আল্লাহ পাক বান্দার তওবা খুব কবুল করেন। বারবার কবুল করেন। আল্লাহ পাকের এক পবিত্র নাম 'আততাওয়াব'। অর্থাৎ আল্লাহ পাক বান্দার দিকে বারবার রহমতের দৃষ্টি দেন। বারবার তওবা কবুল করেন। কুরআন মাজীদে এসেছে إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ 'আততাওয়াব' নামের সাথে আনা হয়েছে 'আর রাহীম' নাম। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর দয়া ও করুণার কারণে বান্দার তওবা বারবার কবুল করেন।

তো এই আয়াতে আল্লাহ পাক আমাদের জন্যে, আমাদের বাস্তব জীবনের জন্যে এক গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি দান করেছেন। গোনাহকে সামান্য মনে না করা। অন্তরে গোনাহর ভাব সৃষ্টি হওয়ামাত্র সাবধান হওয়া। আর কখনো গোনাহ হয়ে গেলে হতাশ না হওয়া। আল্লাহ পাকের রহমত থেকে তো ঐ ব্যক্তি হতাশ হয়, যে আল্লাহ পাকের রহমতকে ছোট মনে করে। আল্লাহ পাক এক হাদীসে কুদসীতে তার মাগফিরাতের প্রশস্ততা বর্ণনা করেছেন। আনাস ইবনে মালিক রা. বলেন, আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ বলেন-

يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيك بقرابها مغفرة

হে আদমসন্তান! তোমার পক্ষ হতে যা-ই প্রকাশ পাক, যে পর্যন্ত তুমি আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে আশা করতে থাকবে আমি তোমাকে ক্ষমা করতে থাকব এবং আমি কোনো পরোয়া করব না। তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, (পৃথিবীর সকল শূন্যতা ভরাট করে) আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এরপর তুমি ইসতিগফার কর। তো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব এবং কোনো পরোয়াই করব না। হে আদমসন্তান! তুমি যদি আমার কাছে আস পৃথিবী-ভরা ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে আর আস কোনো কিছুকে আমার সাথে শরীক না করে তাহলে আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করব পৃথিবী-ভরা মাগফিরাত নিয়ে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৩৫৪০

আল্লাহ পাক এত বেনিয়ায, এত অমুখাপেক্ষী যে, বান্দাকে ক্ষমা করার জন্যে কোনো কিছুর পরোয়া করার দরকার পড়ে না। 'এত বড় গোনাহগার এত বড় পাপী! কীভাবে আপনি তাকে ক্ষমা করলেন'- এমন প্রশ্ন করার কেউ নেই। সেজন্যে আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি তোমাকে মাফ করে দেব এবং কোনো পরোয়াই করব না।

তো যে মালিক এভাবে বান্দাকে ক্ষমা করতে প্রস্তুত সেই মালিকের কাছ থেকে কেন আমি ক্ষমা নেব না? কেন তাঁর কাছে ছুটে যাব না?

আগের যুগের একজন মানুষের ঘটনা আছে যে নিরানববইজন মানুষকে খুন করেছিল। এরপর একসময় তার মধ্যে অনুতাপ এল যে, আমি এত মানুষ হত্যা করে ফেললাম! আমি এত খারাপ! এত পাপী!? তখন সে এক দরবেশের কাছে গিয়ে বলল, আমি তো একে একে নিরানববইজন মানুষকে হত্যা করেছি, আমার কি মুক্তির কোনো পথ আছে? দরবেশ আলেম ছিলেন না। তিনি হয়তো চিন্তা করলেন, যেখানে একজন মানুষকে হত্যা করলেই জাহান্নাম অবধারিত সেখানে নিরানববই হত্যা! বললেন, 'না তোমার মুক্তির কোন উপায় নেই।' সেই লোক উত্তেজিত হয়ে দরবেশকেও হত্যা করল এবং তার মাধ্যমে একশ পূর্ণ করল। এরপরও তার মনে যন্ত্রণা, আসলেই কি আমার মুক্তির কোনো উপায় নেই?! আবার গেল একজনের কাছে। তিনি ছিলেন সে সময়ের একজন আলেম। তাকে গিয়ে বলল,'আমার কি মুক্তির কোনো পথ আছে?' তিনি বললেন, 'কেন থাকবে না? অবশ্যই আছে। তোমার জন্যে তওবার সুযোগ আছে। তুমি গোনাহ করেছ। অনেক বড় অপরাধ করেছ। তাই বলে নিরাশ হবে কেন? আল্লাহ পাকের ক্ষমা, আল্লাহ পাকের দয়া তো তোমার গোনাহর চেয়েও বড়। সুতরাং তুমি নিরাশ হয়ো না। এক কাজ কর, যে এলাকায় তুমি আছ সেটা ভালো না। ওখানের পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে তুমি গোনায় জড়িয়ে যাচ্ছ। তুমি অমুক এলাকায় চলে যাও। ওখানে কিছু ভালো মানুষ আছে। তাদের সাথে মিশে ওখানেই আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে থাক। হতে পারে আল্লাহ পাক তোমার ইবাদত বন্দেগীর ওসীলায় তোমাকে মাফ করবেন, তোমার তওবা কবুল করবেন।' এ কথা শোনার

পর যেন তার ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। সে তখন মুক্তির আশায় ঐ এলাকার দিকে রওয়ানা হল। কিন্তু আল্লাহর হুকুম- ঐ এলাকায় পৌঁছার আগেই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। তার মৃত্যু হয়ে গেল। এখন দুই দল ফিরিশতা এসে গেল তার রূহ নিয়ে যাওয়ার জন্য। জান্নাতের ফিরিশতা এবং জাহান্নামের ফিরিশতা। জাহান্নামের ফিরিশতারা বলছে, এই লোক অনেক বড় পাপী। একশ মানুষের খুনি। আমরা তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাব। আর জান্নাতের ফিরিশতারা বলছে, সে তো তওবা করেছে। সুতরাং আমরা তাকে জান্নাতে নিয়ে যাব। এভাবে যখন ফিরিশতারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারল না তখন তারা আল্লাহ তাআলার কাছে গেল। আল্লাহ তায়ালা তো সব জানেন। তিনি বললেন, তোমরা তার মৃত্যুর জায়গা ও দুই এলাকার দূরত্ব মেপে দেখ। যে এলাকার দিকে সে যাচ্ছিল যদি সেটা নিকটে হয় তাহলে তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। কারণ সে ভালোর দিকে বেশি অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল। আর যদি যে এলাকা থেকে এসেছে সেটা নিকটে হয় তাহলে ধরে নাও সে ভালোর দিকে বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। ফিরিশতারা উভয় দিকের জায়গা মেপে দেখল। এক রেওয়ায়েতে আছে, সে ভাল মানুষদের এলাকার কাছাকাছি যেতে পারেনি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ঐ যমীনকে বললেন- তুমি নিকটে আস। আর পেছনের পথকে বলেছেন- তুমি দীর্ঘ হয়ে যাও। ফলে সে ঐ ভালো অঞ্চলের নিকটবর্তী প্রমাণিত হল এবং জান্নাতের ফিরিশতারা তাকে জান্নাতে নিয়ে গেল।

এই হল আল্লাহ পাকের রহম ও করমের অবস্থা। আল্লাহ পাকের দয়া ও করুণার দৃষ্টান্ত। সুতরাং যিনি এত রহমান, এত রাহীম, যিনি তাঁর বান্দাকে ক্ষমা করার জন্যে এত আগ্রহী তার আশ্রয় কেন আমরা গ্রহণ করব না? তাঁর অবাধ্যতা কেন বর্জন করব না? কেন আমরা পবিত্র জীবন গ্রহণ করব না?

তো কুরআনে পাকে আল্লাহ তাআলা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গায় বান্দাকে তওবার দিকে ডেকেছেন। আল্লাহর দিকে ফিরে আসার প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন। সেজন্যে আমাদের কর্তব্য, গোনাহ হয়ে গেলেই তওবা করা। সেই রহমান ও রাহীম আল্লাহর কাছে ফিরে আসা এবং তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করা।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তাওফীক দান করুন। সবাইকে কবুল করুন। সবাইকে তাঁর নৈকট্যশীল ও প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমিন।

তাকওয়া সম্পর্কিত ঘটনা

আল্লাহকে ভয় পেয়ে দূরে নয়, তার দিকেই ছুটে যেতে হবে

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালাকে ভয় করে চলা একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। যা অন্তরে যথাযথভাবে প্রোথিত হলে জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আস। আর এই পরিবর্তনটি হয় আল্লাহতায়ালার আদেশ-নির্দেশ মোতাবেক।

সুদূর অতীতকালের কোনো এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বলেছিলেন, ‘তুমি যখন অন্যদের ভয় পাও, তাদের থেকে দূরে পালিয়ে যাও। আর যখন আল্লাহকে ভয় পাও, তখন তার দিকেই তুমি ছুটে যাও।

’

বাস্তবে রাসূল হজরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন আল্লাহকে ভয় করার সত্যিকার প্রতীক। তিনি সঠিকভাবেই ঘোষণা করেছেন, আল্লাহকে আমি জানি সবচেয়ে বেশি।আর তোমাদের মধ্যে আমিই তাকে সবচেয়ে বেশি ভয় করি। ’ আল আলবানি এই হাদিসের যথার্থতা উল্লেখ করেছেন।

আপনি আল্লাহতায়ালা, তার নিখুঁত গুণাবলি এবং সর্বপরিবৃত জ্ঞানভিত্তিক কাজ সম্পর্কে যত বেশি জানবেন, তত বেশি ভয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করবেন তাকে। আপনি যত বেশি জানতে পারবেন আপনার অতি তুচ্ছ, নগণ্য ও পাপী সত্তার ব্যাপারে, ততই আল্লাহর ভীতি আপনার মনে প্রবল হয়ে উঠবে।

এ কারণে কোরআনে কারিমে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ‘আল্লাহকে তার বান্দাদের মধ্যে কেউই প্রকৃতপক্ষে ভয় করে না, তারা ছাড়া যারা (আল্লাহর কথা ও কাজ সম্পর্কে) সম্যক জ্ঞানের অধিকারী। -সূরা আল মুমিনুন: ২৮

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহকে যে ভয় করে চলতেন, তা তার জীবনযাত্রায় অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতো। আল্লাহতায়ালা যে সব কিছুর ওপর নজর রাখেন, সে বিষয়ে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) সচেতন থাকতেন সব সময়। তার সজাগ হৃদয় প্রতি মুহূর্তেই আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পিত থাকত। রাসূল (সা.)-এর হৃদয়জুড়ে ছিল আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা। এভাবে তিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এসব কিছু বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন তার প্রিয় সাহাবা বা সঙ্গীরা।

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর অন্তর এতটাই কোমল ছিল যে, কোরআন তেলাওয়াতের সময়ে তিনি কাঁদতেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কীকরণের প্রতিক্রিয়ায়। তার মাথার চুল

পেকে যাওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে রাসূলুল্লাহ (সা.) জবাবে বলেছিলেন, সূরা হুদসহ যেসব সূরায় শেষ বিচারের দিনের আতঙ্কজনক ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রভাবেই তার চুল ধারণ করেছে ধূসরবর্ণ।

আল্লাহর ভয় ছিল রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মনজুড়ে। তাই সেখানে অহঙ্কারের কোনো স্থান ছিল না এবং এই হৃদয় তার মহান প্রভুর সকাশে ছিল অতিশয় বিনীত। এই প্রেক্ষাপটে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) তার উম্মতকে নিষেধ করে গেছেন, যাতে তারা তার প্রশংসা ও মূল্যায়নে বাড়াবাড়ি কিংবা সীমা লঙ্ঘন না করে।

সহিহ বোখারিতে উল্লেখ রয়েছে তার এই বাণী। সেখানে বলা হয়েছে, 'খ্রিস্টানরা হজরত মরিয়মের সন্তানকে নিয়ে যা করেছে, তোমরা সেভাবে চরম পন্থা অবলম্বন করো না আমার প্রশংসা করতে গিয়ে। আমি (আল্লাহর) এক বান্দা মাত্র; তাই তোমরা বলবে (তিনি) আল্লাহর বান্দা ও তার বার্তাবাহক। '

সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গেও রাসূলে কারিম (সা.) খুবই বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করতেন এবং বলতেন, 'আমি (আল্লাহর) কেবল একজন বান্দা। আমি বান্দা বা দাসের মতো আহার গ্রহণ করি এবং তাদের মতোই উপবেশন করি। '

হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) গৃহস্থালি কাজকর্মে সাহায্য করতেন তার পরিবারকে এবং যেকোনো দয়ালু ও সাহায্য করতে আগ্রহী লোক নিজ ঘরে যেভাবে করে থাকেন, সেভাবেই তিনি তা করতেন।

তা ছাড়া নিজের কথা ও কাজের ওপর হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিয়ন্ত্রণ থাকত পুরোপুরি। তিনি শুধু সেটাই বলতেন, যা সত্য। সব সময়েই তার কথা ও কাজে পুরো মিল থাকত। তিনি কোনো দিন কারও প্রতি মন্দ বা ভ্রান্ত আচরণ করেননি। কিংবা কোনো নারী, চাকর বা আর কাউকে প্রহার করেননি আল্লাহর নির্দেশ ব্যতিরেকে। নিজের ব্যক্তিগত কারণে কোনো সময়ই নেননি প্রতিশোধ। তবে আল্লাহতায়ালার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘনের প্রতিকারে পদক্ষেপ নিয়েছেন।

ঝড়ঝঞ্ঝার সময়ে আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হলে অথবা সূর্যগ্রহণ ঘটলে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মুখমণ্ডলে ফুটে উঠত ভীতির চিহ্ন। তখন তিনি দ্রুত আল্লাহর শরণাপন্ন হয়ে মাথা নত করতেন। এটা করতেন মহাবিশ্বের মহান প্রভুর প্রতি ভয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় তাকে মনে করিয়ে দিত যে, অতীতে আল্লাহর না-ফরমান জাতিগুলো প্রকৃতির দুর্যোগময় ঘটনা দ্বারাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আল্লাহর ভয় রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্বুদ্ধ করেছিলো প্রয়োজনীয় ধৈর্যধারণে এবং কঠিন পরিশ্রমী হতে। আর এই ধৈর্য ও শ্রম গুরুত্বপূর্ণ ছিল দ্বীনের দাওয়াত কার্যকর করার

জন্য। তার মিশনের সূচনা থেকেই দৈহিক-মানসিক কষ্ট ও দুর্ভোগের নানা অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করেছিলেন।
হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) যে আল্লাহকে ভয় করতেন, তা কিন্তু দুর্বল বা ভিতু হৃদয়ের পরিচায়ক নয়। সঙ্গী-সাথীদের চেয়ে তিনি বেশি সাহসি ছিলেন। তার এতই সাহস ছিল যে, যুদ্ধের ময়দানে তিনি শত্রুবাহিনীর সবচেয়ে নিকটবর্তী হতেও দ্বিধা করতেন না। হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) আল্লাহকে যেভাবে ভয় করেছেন, তা হচ্ছে ভীতির আদর্শ ধরন। কারণ, এই ভীতির কারণে তিনি সন্ন্যাসীদের মতো কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন করেননি। এমনকি তার উম্মতকে নিষেধ করে গেছেন সংসার ত্যাগের ব্যাপারে। তার স্ত্রী-সন্তান ছিল, পছন্দ করতেন সুগন্ধি, কোনো কোনো খাবার তার কাছে বিশেষ পছন্দনীয় ছিল। অবশ্য সাধারণত কখনও পরপর দু'দিন গমের রুটি দিয়ে ক্ষুধার পুরো নিবৃত্তি করতে পারেননি তিনি ও তার পরিবার। অনেক সময়ে দিনের পর দিন তার ঘরে খাবার রান্নার জন্য চুলা জ্বলত না।
এই প্রেক্ষাপটে আমরা স্মরণ করতে পারি, তিনজন লোকের কাহিনী। তারা এসেছিলেন ইবাদতের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ত্যাগ, নিষ্ঠা ও শ্রম সম্পর্কে খোঁজ নিতে। তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে জানতে পেরে এই তিন ব্যক্তি ভাবলেন, রাসূল (সা.) তো আগে থেকেই আল্লাহর ক্ষমাপ্রাপ্ত। কিন্তু তাদের গোনাহ মাফ করার কোনো নিশ্চয়তা নেই। অতএব, তাদের আরও সাধারণ জীবনযাপন করতে হবে। ' তাই তাদের একজন ঘোষণা দিলেন, আমি ইবাদত-বন্দেগি করে রাত কাটিয়ে দেবো এবং ঘুমাব না। ' আরেকজন ঠিক করলেন যে, 'বিয়ে করবো না। ' তৃতীয় ব্যক্তির ঘোষণা ছিলো- 'অব্যাহতভাবে রোজা রাখার। '
তাদের এসব সিদ্ধান্ত জানতে পেরে হজরত রাসূলুল্লাহ (সা.) এভাবে চিন্তাভাবনা করার কারণে ভর্ৎসনা করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে আমি সবচেয়ে আল্লাহভীরু। তবুও আমি রোজা রাখি, আবার ভাঙিও। রাতের বেলায় ইবাদত করি, আবার ঘুমাই। আমি বিয়েশাদিও করেছি। ' হজরত রাসূলুল্লাহ
(সা.) এ কথার মাধ্যমে যে উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়েছেন, সেটাই সর্বোত্তম।
নবী কারীম (সা.)-এর জীবনযাত্রার এই যে নিদর্শন, এটা তার অসাধারণ চরিত্রের বিস্ময়কর ভারসাম্যের নজিন। আর এই দৃষ্টান্ত চিরদিনের জন্যই অনুসরণীয়।

আল্লাহর ভয়

ইমাম ইবনে জারীর তবারী রাহ. তাঁর 'তারীখুল উমামি ওয়াল মুলূম' গ্রন্থে হিজরী ১৬ সনের ঘটনাবলীতে লেখেন, "মুসলমানদের 'মাদায়েন' জয়ের পর যখন গনীমতের সম্পদ একত্র করা হল তখন এক ব্যক্তি একটি বড় পাত্র নিয়ে হাজির হলেন, যা ছিল বহুমূল্য জাওয়াহেরাতে পূর্ণ। তিনি পাত্রটি গনীমতের দায়িত্বশীলদের বুঝিয়ে দিলেন। সবাই তা দেখে বিস্মিত হয়ে বলল, এরকম মহামূল্য সম্পদ তো আমরা কখনো দেখিনি। এ তো গনীমতের সমুদয় সম্পদের চেয়েও মূল্যবান! তারা ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করল-

هل أخذت منه شيئا؟

এখান থেকে কিছু নিজের জন্য রেখে দাওনি তো?

আগন্তুক বললেন-

أَمَا وَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا أَتَيْتُكُمْ بِه

শোনো! আল্লাহর ভয় না থাকলে এটা তোমাদের কাছে নিয়ে আসতাম না।

সবাই বুঝতে পারল, তিনি সাধারণ মানুষ নন। তারা জিজ্ঞাসা করল, আপনি কে? আপনার পরিচয় দিন। তিনি বললেন-

لا والله لا أخبركم لتحمدوني، ولا غيركم ليقرظوني، ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه.

আল্লাহর কসম! আমার না আছে প্রশংসার প্রয়োজন, না কারো স্বীকৃতির। সুতরাং কারো কাছেই আমি আমার পরিচয় প্রকাশ করব না। আমি আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর প্রতিদানেই সন্তুষ্ট।

এ বলে তিনি প্রস্থান করলেন। তারা এক লোককে তাঁর পিছু পিছু পাঠাল। সে লোকদের কাছ থেকে জেনে এল যে, তিনি ছিলেন আমের ইবনে আব্দে কায়স আলকায়সী। বিখ্যাত ইবাদতগুযার তাবেয়ী। বসরায় ইবাদত-বন্দেগীতে সর্বপ্রথম তিনিই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তারীখুল উমুমি ওয়াল মুলূক : ৪/১৭৬

কোরআনে যেভাবে আল্লাহকে ভয় করতে বলা হয়েছে

আল্লাহর ভয় একজন মুমিনের অন্যতম সম্পদ। মনে সবসময় সবসময় আল্লাহ তায়ালার ভয় থাকা ঈমানের অন্যতম একটি অংশ। মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে এবং মনে এই বিশ্বাস রাখে যে তার সব কাজ আল্লাহ দেখছেন একদিন আল্লাহর সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে এবং সব কিছুর হিসাব দিতে হবে, তখন মানুষের পাপাচার কমে যায়।

- এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, জাহান্নামের আগুন সেই চোখকে স্পর্শ করবে না; আল্লাহর ভয়ে যাদের চোখ থেকে পানি ঝরে।' আল্লাহ তায়ালা নিজেও পবিত্র কোরআনে মুমিনদের তাকে ভয় করার নির্দেশ দিয়েছেন। বর্ণিত হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوۡتُنَّ اِلَّا وَ اَنۡتُمۡ مُّسۡلِمُوۡنَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।' (সুরা আল-ইমরান : আয়াত ১০২)

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন,

فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

'তোমরা যদি মুমিন-ই হয়ে থাক, তাহলে তাদেরকে নয় আমাকেই ভয় কর। (সূরা তাওবা, আয়াত, ১৭৫)

আরও বর্ণিত হয়েছে,

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ

'তোমরা মানুষকে ভয় করো না, আমাকে ভয় কর। (সুরা আল মায়িদা, আয়াত, ৪৪)

وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

'আর ভয় কেবলমাত্র আমাকেই কর। (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ৪০)

অন্য জায়গায় আল্লাহভীতিকে মুমিনের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা বলেন,

وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ

'তারা সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত, ২৮)

মহান রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

তারা ভয় ও আশা নিয়ে আমাকে ডাকতো এবং তারাই ছিলো আমার কাছে বিনয়ী। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত, ৯০)

যারা আক্ষরিক অর্থেই আল্লাহকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে পুরস্কার। ইরশাদ হয়েছে,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ

'যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে একদিন দাঁড়াতে হবে, এই ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে (জান্নাতে) দুটো বাগান। (সূরা আর রাহমান, আয়াত, ৪৬)

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ

যারা আমাকে এবং আমার আজাবের ওয়াদাকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে এ মর্যাদা। (সূরা ইবরাহীম, আয়াত, ১৪)

সাহাবিদের জীবনে তাকওয়া: এক অনুপ্রেরণার উৎস

সাহাবিরা ছিলেন ইসলামের প্রথম প্রজন্মের মুসলমান। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি দেখেছেন, তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সুন্নতের ওপর আমল করেছেন। তাদের জীবন ছিল তাকওয়ার জ্বলন্ত উদাহরণ। আসুন দেখি, তাদের জীবনে তাকওয়ার প্রতিফলন কেমন ছিল:

* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা থেকে দূরে থাকা: সাহাবিরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধকে নিজের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিতেন। তাঁর এক আদেশ তাদের কাছে হাজার হাজার নিষেধের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
* কুরআন ও সুন্নাহের অনুসরণ: সাহাবিরা কুরআন ও সুন্নাহকে তাদের জীবনের নির্দেশিকা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তারা কুরআনের প্রতিটি আয়াত ও হাদিসের তাৎপর্য বুঝার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের জীবনে প্রয়োগ করেছেন।
* ইবাদাতের মধ্যে নিমগ্নতা: সাহাবিরা ইবাদাতকে তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিয়েছেন। নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদাত তারা আন্তরিকভাবে আদায় করেছেন।
* হারাম থেকে দূরে থাকা: সাহাবিরা হারাম কাজ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করেছেন। তারা হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পেরেছেন এবং হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবন যাপন করেছেন।

* সত্যবাদিতা ও আমানতদারি: সাহাবিরা সর্বদা সত্য কথা বলেছেন এবং আমানত রক্ষা করেছেন। তারা কখনো মিথ্যা কথা বলেননি এবং অন্যের জিনিসে চুরি করেননি।
* ইলম অর্জন ও শিক্ষা প্রদান: সাহাবিরা ইসলামি জ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং অন্যদেরকেও ইসলাম শিক্ষা দিয়েছেন।
* সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ: সাহাবিরা সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করেছেন, অসহায়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন।
* সহনশীলতা ও ভ্রাতৃত্ব: সাহাবিরা অন্যদের প্রতি সহনশীল ছিলেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রেখেছেন।

সাহাবিদের জীবন থেকে আমরা কী শিখতে পারি?

সাহাবিদের জীবন থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। তাদের জীবন আমাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণার উৎস। তাদের মতো আমরাও যদি তাকওয়াকে জীবনের মূল ভিত্তি করে নিই, তাহলে আমরাও সফল জীবন যাপন করতে পারব।

* তাকওয়া জীবনের সফলতার চাবিকাঠি: তাকওয়া আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করে এবং আমাদেরকে সব ধরনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে।
* তাকওয়া মনের শান্তি দেয়: তাকওয়া আমাদের মনকে শান্ত করে এবং আমাদেরকে আত্মিক সুখ দেয়।
* তাকওয়া সমাজের কল্যাণের জন্য: তাকওয়া সমাজকে শান্তিপূর্ণ এবং সুন্দর করে তোলে।

আমাদের করণীয়:

* আমাদেরকে সাহাবিদের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
* আমাদেরকে তাকওয়াকে জীবনের মূল ভিত্তি করে নিতে হবে।
* আমাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আমাদের জীবন গড়তে হবে।
* আমাদেরকে ইবাদাতকে আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ করে নিতে হবে।
* আমাদেরকে হারাম থেকে দূরে থাকতে হবে এবং হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবন যাপন করতে হবে।
* আমাদেরকে সত্যবাদী ও আমানতদার হতে হবে।
* আমাদেরকে ইলম অর্জনের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং অন্যদেরকেও ইসলাম শিক্ষা দিতে হবে।
* আমাদেরকে সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ করতে হবে।

* আমাদেরকে অন্যদের প্রতি সহনশীল হতে হবে এবং মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।

হযরত আবু যর গিফারী রা.। পুরো নাম আবু যর জুনদুব ইবনে জুনাদাহ আল কিন্দী আল গিফারী । একজন খ্যাতিমান সাহাবী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অত্যন্ত প্রিয়ভাজন সঙ্গীদের অন্যতম। নবীজী (সা.) এর প্রাণোৎসর্গী শিষ্য। ইসলাম প্রচারের শুরুর দিকে তিনি মুসলমান হন। তিনি ইসলাম গ্রহনের ধারাবাহিকতায় চতুর্থ বা পঞ্চম ব্যক্তি। সুদৃঢ়ভাবে কুরআন সুন্নাহর নির্দেশনা মনে চলার ক্ষেত্রে তার বিশেষ খ্যাতি রয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) এর অত্যন্ত স্নেহভাজন প্রিয় এই সাহাবী একদিন নবীজির কাছে কিছু নসীহতের আবদার করেন। জীবন পথের পাথেয়স্বরূপ কিছু উপদেশ কামনা করেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুবই উপকারী কয়েকটি উপদেশ প্রদান করেন। একেকটি উপদেশ স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত। যেগুলো গভীর মর্মসমৃদ্ধ, আলোকিত জীবন গঠনের মৌলিক পাথেয়। কী সেই অসাধারণ উপদেশমালা?

১. তাকওয়া অবলম্বন কর। মনে রেখো, তাকওয়া তোমার জীবনের প্রতিটি কাজে অপার সৌন্দর্য বয়ে আনবে। ২. কুরআন তিলাওয়াত ও আল্লাহর যিকিরে সবিশেষ মনোযোগ দাও। মনে রেখো, এ দুটো কাজ তোমাকে আকাশে আলোচনার বস্তু বানাবে এবং তোমার জন্যে পৃথিবীতে আলো বয়ে আনবে। ৩. দীর্ঘ সময় চুপ থাকার অভ্যাস করে নাও। শয়তানকে তোমার কাছ থেকে দূরে রাখতে এটা কার্যকরী ভূমিকা রাখবে এবং তোমার দ্বীনী কাজে এটা ভীষণ সহায়ক হবে। ৪. অধিক পরিমাণে হাসাহাসি করা থেকে বিরত থেক। কেননা, অধিক হাসি অন্তরকে নির্জীব করে দেয় এবং এতে করে চেহারার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে যায়।

৫. সব সময় সত্য কথা বলবে এবং সত্যের পথে অটল অবিচল থাকবে। যদিও এটি অত্যন্ত তিক্ত ও সুকঠিন কাজ। ৬. আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে কারো সমালোচনাকে ভয় করবে না। ৭. নিজের দোষত্রুটি সম্পর্কে অবগতি যেন তোমাকে অন্যের দোষত্রুটি অনুসন্ধানে বাধা দেয়।

দীর্ঘ এই উপদেশপূর্ণ হাদিসটি ইমাম আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল বায়হাকী রহ. তার কিতাবে বর্ণনা করেছেন। যিনি ৩৮৪ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করে ৪৫৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কী অসাধারণ একেকটি উপদেশ! কত সারগর্ভ প্রতিটি নসীহত। আলোকিত সফল জীবন গঠনে কতটা কার্যকরী প্রতিটি বাণী। গুরুত্বপূর্ণ এই

সাতটি উপদেশের মধ্য থেকে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় প্রথম উপদেশটি। তাকওয়া।

তাকওয়া অর্জনের উপায়

তাকওয়া অর্জন একটি সারাজীবনের চেষ্টা। এটি একদিনে অর্জন করা যায় না। তবে কিছু উপায় অনুসরণ করে তাকওয়া অর্জনের চেষ্টা করা যেতে পারে।

তাকওয়া অর্জনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ উপায়:

* কুরআন ও সুন্নাহ অধ্যয়ন: কুরআন ও সুন্নাহ হল ইসলামের মূল উৎস। এগুলোকে ভালোভাবে অধ্যয়ন করলে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান পাওয়া যায় এবং তাকওয়া অর্জন করা সহজ হয়।
* ইবাদত-বন্দেগি: নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগি আল্লাহর সাথে যোগাযোগের মাধ্যম। এগুলো নিয়মিত আদায় করলে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।
* জিকির: আল্লাহর নাম জিকির করা, তাঁর গুণাবলি ধ্যান করা, তাঁর কাছে দোয়া করা ইত্যাদি ধিকর অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে।
* সৎকর্ম: অন্যদের উপকার করা, গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করা, ইসলামের দাওয়াত দেয়া ইত্যাদি সৎকর্ম তাকওয়াকে শক্তিশালী করে।
* মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকা: মিথ্যা কথা বলা, গীবত করা, চুরি করা, অন্যায় করা ইত্যাদি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলে অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি হয়।
* সৎসঙ্গ: সৎ মানুষের সঙ্গে মেলাজোল করলে তাকওয়া অর্জন করা সহজ হয়।
* আত্মমূল্যায়ন: নিজের কাজকর্মের ওপর নিয়মিত নজর রাখা এবং ভুলত্রুটি সংশোধন করার চেষ্টা করা।
* আল্লাহর ভয়: আল্লাহর শাস্তির ভয় এবং জান্নাতের আশা অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করে।

তাকওয়া অর্জনের বাধা:

* গুনাহ: গুনাহগার কাজগুলো অন্তরে তাকওয়ার বীজকে ধ্বংস করে দেয়।
* শয়তানের ফাঁদ: শয়তান মানুষকে গুনাহের দিকে প্রলুব্ধ করে এবং তাকওয়া থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করে।
* দুনিয়ার মোহ: দুনিয়ার মোহ মানুষকে আখেরাতের কথা ভুলে যায় এবং তাকওয়া থেকে বিচ্যুত করে।
* অহংকার: অহংকার মানুষকে আল্লাহর কাছে নত হতে বাধা দেয় এবং তাকওয়া অর্জনকে কঠিন করে তোলে।

সুশৃঙ্খল জীবন লাভে আল্লাহভীতির প্রভাব

জীবনে সুখ ও সফলতা লাভ করতে চাইলে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশ মানতে হবে। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ, তাই জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তাঁর নির্দেশনা মান্য করা ও তাঁর প্রতি অন্তরে বড়ত্বের ভয় লালন করা জরুরি। এর মাধ্যমেই মানুষের জীবন হয় সার্থক ও সফল। আল্লাহর ভয়ে নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকা বা যে কাজ করার কারণে মানুষকে আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়, তা থেকে নিজেকে রক্ষা করা হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি।

আর যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয় রয়েছে এবং যারা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকেন তাদের বলা হয় মুত্তাকি। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) মুত্তাকিদের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে- ‘যারা মহান আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এমন সব কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকে, যেগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কিত বিধান কুরআন-হাদিস থেকে তারা জানতে পারে এবং অনুসরণের জন্য রাসুল (সা.) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর রহমত কামনা করে’ (তাফসিরে তাবারি : ১/১৪)। তাকওয়া সম্পর্কে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেকের উচিত আগামীর (পরকাল) জন্য সে কী প্রেরণ করে তা চিন্তা করা। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত।’ (সুরা হাশর : ১৮)

মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে আল্লাহভীতি। তা মানুষের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার শক্তি জাগ্রত করে। ফলে মন্দ ও অশ্লীল কাজের অসংখ্য সহজ পথ উন্মুক্ত থাকার পরও আল্লাহভীরু নিজেকে প্রাণপণ তা থেকে বিরত রাখে। দুর্নীতির উন্মুক্ত পরিবেশ বিদ্যমান থাকার পরও সে তা এড়িয়ে চলে। তাকওয়া বা আল্লাহভীতি মানবজীবনকে এমন এক সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করে, যা সব ধরনের ভীতি, লালসা, প্রতারণা, প্রলোভন, পদস্খলন থেকে নিরাপদ রাখে। মুত্তাকির ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন, ‘পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস’ (সুরা নাজিয়াত : ৪০-৪১)।

অন্যত্র বলেন, ‘হে ইমানদারগণ, তোমরা যদি তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে আল্লাহ তোমাদের ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি দেবেন, তোমাদের পাপমোচন করবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ মহা-অনুগ্রহের অধিকারী’ (সুরা আনফাল : ২৯)। তাকওয়া কারও ভেতরে থাকলে সে অসদাচরণ করবে না। মানুষকে ঠকাবে না। এমনকি তাকওয়ার গুণ না থাকলে কেউ খাঁটি মুসলমানও হতে পারবে না।

পার্থিব জীবনে মানুষের প্রত্যাশা বিপুল। মানুষ কামনা করে নিরাপত্তা, স্বাচ্ছন্দ্য, পর্যাপ্ত রিজিক এবং পরকালের সফলতা। আর আল্লাহ তাকওয়ার মাধ্যমে সব প্রত্যাশা পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য পথ করে দেন, এমনভাবে রিজিকের ব্যবস্থা করেন যে, যা সে কল্পনাও করতে পারে না' (সুরা তালাক : ২-৩)। যারা তাকওয়া অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের জন্য আসমান ও জমিনের নেয়ামত উন্মুক্ত করে দেন। তিনি বলেন, 'যদি জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তা হলে আমি তাদের প্রতি আসমান ও জমিনের কল্যাণ উন্মুক্ত করে দিতাম।' (সুরা আরাফ : ৯৬)

মহান আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা লাভের মাপকাঠি হচ্ছে তাকওয়া। অর্থাৎ যে যত বেশি তাকওয়া অবলম্বন করবে সে তত আল্লাহর অধিক প্রিয় বলে গণ্য হবে। এ বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকি' (সুরা হুজুরাত : ১৩)। তাকওয়ার গুণই ইহকাল-পরকালে সাফলতা এনে দিতে পারে। তাকওয়ার গুণ অর্জনকারীদের আল্লাহ ভালোবাসেন। বর্ণিত হয়েছে, 'আল্লাহ তাকওয়া অবলম্বনকারীদের ভালোবাসেন' (সুরা তাওবা : ৪)। অন্যত্র বলেন, 'তাঁর (আল্লাহর) বন্ধু তো কেবল তাকওয়া অবলম্বকারীরাই' (সুরা আনফাল : ৩৪)। আল্লাহর নৈকট্য ও সহায়তা লাভের জন্য তাকওয়া অবলম্বনের কোনো বিকল্প নেই। তিনি বলেন, 'তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকিদের সঙ্গে আছেন' (সুরা বাকারা : ১৯৪)। তাকওয়া ঈমানদারকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করে। মহানবী (সা.) বলেন, 'দুটি চোখ জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে অশ্রু ঝরায়। আর যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারা দিতে গিয়ে নিদ্রাহীন রাত কাটায়।' (তিরমিজি : ১৬৬৩)

জীবনে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির গুণ ধারণের অন্যতম উপায় হলো 'উসিলা' তালাশ করা। কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, 'হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর পর্যন্ত পৌঁছার জন্য উসিলা সন্ধান করো' (সুরা মায়িদা : ৩৫)। মুফাসসিরগণ উসিলার বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ বলেছেন, 'উসিলা হলো নেক আমলের নাম। অর্থাৎ যত বেশি নেক আমল করা হবে, ততই তাকওয়া হাসিল হবে এবং আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জন হবে।' কেউ আবার অন্য ব্যাখ্যাও করেছেন।

তারা বলেন, 'উসিলা তালাশ করার অর্থ হলো এমন ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করা, যারা তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত। এটি তাকওয়া অর্জনের সবচেয়ে সহজ ও অন্যতম ফলপ্রসূ পন্থা।'

তাকওয়া অর্জনের অন্যতম আরেক পন্থা হলো, 'সোহবত বা সাহচর্য।' এ কথা স্বীকৃত যে, সোহবতের মাধ্যমে মানুষের কর্ম ও চিন্তায় এবং চরিত্র ও নৈতিকতায় পরিবর্তন আসে। ভালোর সঙ্গে ওঠাবসা হলে তার প্রভাব ব্যক্তিজীবনে পরিলক্ষিত হয়। মন্দের সঙ্গে চলাফেরা হলে মন্দত্বের প্রভাব ওই সত্তার মধ্যে ঢুকে পড়ে। তা ছাড়া দ্বীন মূলত সোহবতের মাধ্যমেই চলমান। সাহাবারা রাসুল (সা.)-এর সোহবত লাভ করেছিলেন। সাহাবাদের সোহবত লাভ করেছেন তাবেয়িগণ। এভাবে তাবেয়িগণের সোহবত লাভ করেছেন তাবে-তাবেয়িগণ। আসুন, দুনিয়ার ধোঁকায় না পড়ে পরকালের দিকে ধাবিত হই। তাকওয়ার চর্চা করে মুত্তাকি হই। আল্লাহ আমাদের তাঁর প্রিয় বান্দা হওয়ার তওফিক দান করুন। উভয় জাহানে সফলতা দান করুন।

মুত্তাকী

মুত্তাকী (আরবি: مُتَّقِينَ বা **তক্বী** (আরবি: تقي) শব্দের অর্থ ইসলাম ধর্ম অনুসারে ধার্মিক, আল্লাহ ভীরু। তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়। অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় আছে এবং যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করেন তারাই মুত্তাকী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ (রা) বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবিরা গুনাহ এবং অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে মুক্ত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়। মুত্তাকী ব্যক্তি সততা, আমানতদারি, সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা, ন্যায় ও ইসলামের গুণে গুণান্বিত হয়ে থাকে। মুত্তাকীর গুণাবলিঃ কুরআন হলো মানুষের জন্য হিদায়াত বা পথপ্রদর্শক। কিন্তু সবাই এই কুরআন থেকে হিদায়াত পাবে না। হিদায়াত পাবেন তারাই যারা তাকওয়া অবলম্বনকারী, তথা মুত্তাকী, 'হুদাল্লিল মুত্তাকিন অর্থাৎ এই কুরআন হলো মুত্তাকীদের জন্য হিদায়েত।' আর মুত্তাকী হলো তারা 'যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামাজ কায়েম করে এবং তাদের যে জীবনোপকরণ দান করেছি তা থেকে ব্যয় করে, আর তোমার প্রতি যে কিতাব নাজিল করা হয়েছে এবং তোমার আগে যা নাজিল করা হয়েছিল, তার ওপর ঈমান আনে এবং আখেরাতের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তারাই তাদের প্রতিপালকের নির্দেশিত পথে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (সূরা বাকারাঃ ৩-৫)। উপরিউক্ত আয়াত গুলোতে মুত্তাকীদের পাঁচটি মৌলিক গুণের কথা বলা হয়েছেঃ

১।অদৃশ্য, দৃষ্টির অন্তরালের বস্তু, যা ইন্দ্রিয়ানুভূতির অতীত,যেমন আল্লাহ, ফেরেশতা, আখেরাত, জান্নাত, জাহান্নাম ইত্যাদি ঈমান আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। ২। যথাযথ ভাবে যথা নিয়মে, যথা সময়ে সব শর্ত পালন করে একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে নামাজ সম্পাদন করা। ৩। আর্থিক ত্যাগ স্বীকার করে মানব কল্যাণে আল্লাহতায়ালার পথে ব্যয় করার মানসিকতাসম্পন্ন হওয়া। ৪। আল্লাহ তায়ালার

দিকনির্দেশনা সংবলিত সব আসমানি তাবে বিশ্বাস স্থাপন করা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হিসেবে আল-কুরআনুল কারিমকে স্বীকার করা ও সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা। ৫। মুত্তাকির পঞ্চম গুণ হচ্ছে পৃথিবীর জীবনের কর্মের চিরস্থায়ী ফলাফল পাওয়ার জন্য আখিরাতের জীবনের ওপর সুদৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। স্বামীর আনুগত্য ও খেদমত করা স্ত্রীর উপর ওয়াজিব। আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ পুরুষরা নারীদের কর্তা, কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং এজন্যে যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। কাজেই পূণ্যশীলা স্ত্রীরা অনুগতা। (সূরা নিসাঃ ৩৪) মুসনাদে আহমাদ বর্ণিত হাদিসে আছে, যে মহিলা যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, রমজান মাসের রোজা রাখে, নিজের সতীত্ব রক্ষা করে চলে এবং স্বামীর পূর্ণ আনুগত্য করে, তার ইচ্ছা, সে জান্নাতের যে কোনো দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ ব্যতীত যদি অন্য কাউকে আমি সিজদা করার নির্দেশ দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীকে সিজদা করার অনুমতি দিতাম। (তিরমিযীঃ ১১৫৯) মোট কথাঃ ইসলাম পুরুষকে নারীর নেতা বানিয়েছে। নারীর উপর কর্তব্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার স্বামীর যা আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন তার আনুগত্য করা। অর্থাৎ স্বামী বেনামাজি এবং বদমেজাজি হলেও তার আনুগত্য করা ওয়াজিব। আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাত হবে তার আবাসস্থল।"

— সূরা নাযিআত ৭৯ : ৪০-৪১

গুনাহের পরিস্থিতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমন কারো প্রতি ক্রোধ জাগ্রত হয়েছে, এ অবস্থায় আল্লাহর ভয়ে সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর কাছে মুত্তাকী হিসাবে গণ্য হয়। তাবেয়ী ইমাম মুজাহিদ উপরের আয়াতের ‘শয়তানের পক্ষ হতে কুমন্ত্রণাকে’ ‘ক্রোধ’ শব্দের দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যান্য গুনাহের পরিস্থিতিতেও আল্লাহর ভয়ে নিজকে নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা ‘তাকওয়ার’ পরিচয় পাওয়া যায়।

মুত্তাকীদের ৫ টি বৈশিষ্ট্যঃ

১. সবসময় মনের ভেতর আল্লাহ তায়ালার ভয় রাখেন।

মুত্তাকী হলেন আল্লাহ পাকের ঐসকল বান্দা, যাদের অন্তরে আল্লাহ পাকের ভয় আছে এবং যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকেন। আল্লাহকে স্মরণ করার এক পর্যায় হল, গুনাহের পরিস্থিতি তৈরি হলে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং গুনাহে লিপ্ত হওয়া থেকে বিরত থাকা। কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় করে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, জান্নাতই হবে তার আবাস।'-সূরা নাযিআত ৭৯ : ৪০-৪১

. কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখেন।

৩. সবসময় সৎকর্ম করা ও অসৎকর্ম থেকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন এবং অন্যকেও এ ব্যাপারে করার ও বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

৪. কোন মন্দ কাজে জরিয়ে পরলে সাথে সাথে আল্লাহ তায়ালার কাছে আনুশোচনাগ্রস্থ হন।

যখন কোনো বান্দা আল্লাহর দিকে ফিরতে শুরু করে তখন আল্লাহ কত খুশি হন হযরত রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة، فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কোনো মরুভূমিতে সফর করছে। যে উটে সফর করছে তাতেই তার পাথেয় ও সামানা। কোথাও হয়ত যাত্রা বিরতির জন্য একটু নেমেছে। এদিকে সুযোগ পেয়ে উটটি পালিয়ে গেল। এখন এই ধূ ধূ মরুভূমিতে মৃত্যুর প্রহর গোনা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এই প্রান্তর পায়ে হেঁটে পাড়ি দেওয়া সম্ভব নয়, আর পানি ও পাথেয় ছাড়া বেঁচে থাকাও সম্ভব নয়। অতএব মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে এক গাছের নিচে এসে শুয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলে দেখে, তার সেই উট সব পাথেয়সহ তার সামনে উপস্থিত। আনন্দের আতিশয্যে ভুলে বলে ফেলেছে اللهم أنا عبدي وأنت ربك(হে আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা,তুমি আমার রব) রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এ বান্দা ঐ মুহূর্তে তার উট ফিরে পেয়ে যে পরিমাণ আনন্দিত হয়,

আল্লাহ পাক তার ফিরে আসা বান্দার প্রতি তারচেয়েও বেশি খুশি হন। - [সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৭৪৬]

৫. তারা জান্নাতে আল্লাহ তায়ালার সান্নিধ্য লাভের আশা রাখেন।[২]নিশ্চয়ই আল্লাহ মুত্তাকিদের ভালোবাসেন"কারণ মহান আল্লাহ তায়ালা সকল পছন্দনীয় বিষয়কে মুত্তাকীরা মেনে নেন নিজের জীবনে প্রয়োগ করেন।ব্যাখ্যা করা হলো -

তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে মুত্তাকী বলা হয়। অর্থাৎ যাদের অন্তরে আল্লাহ তায়ালার ভয় আছে এবং যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধ পালন করেন তারাই মুত্তাকী। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবিরা গুনাহ এবং অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে মুক্ত রাখে তাকে মুত্তাকী বলা হয়

তাকওয়া র স্তর

কাজি নাসিরুদ্দিন বায়দাবি (রহ.) তাফসিরে বায়দাবিতে তাকওয়ার তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন। তা হলো:

এক. শিরকমুক্ত হয়ে চিরস্থায়ী আজাব থেকে বাঁচার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, 'আর তাদের তাকওয়ার কালেমা তথা একত্ববাদের ওপর সুদৃঢ় রাখলেন।' (সুরা ফাতাহ: ২৬) এই স্তরের মূল কথা হলো কুফর ও শিরক থেকে বেঁচে থাকা। এই অর্থে একজন সাধারণ মুসলমানও মুত্তাকি বা তাকওয়াবান; যদিও তার থেকে গুনাহ্ প্রকাশ পেয়ে থাকে। এ অর্থ বোঝানোর জন্য পবিত্র কোরআনের বহু জায়গায় মুত্তাকুন, মুত্তাকিন, তাকওয়া বহুবচন বা ব্যাপক অর্থবোধক ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে।

দুই. যা করলে পাপ অথবা ছাড়লেও পাপ এমন সবকিছু থেকে দূরে থাকা। এক কথায় সব গুনাহ বর্জন করা। ইসলামি শরিয়তে একেই সাধারণত তাকওয়া বলা হয়। পবিত্র কোরআনের বাণী 'আর যদি সেসব জনপদবাসী ইমান আনতো এবং তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশসমূহ ও পৃথিবীর কল্যাণধারা উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা (সত্য) প্রত্যাখ্যান করেছে।' (সুরা আরাফ: ৯৬)

তিন. আল্লাহ তাআলার স্মরণ থেকে বিরত রাখে এমন সবকিছু থেকে অন্তরকে পবিত্র রাখা এবং সম্পূর্ণরূপে আল্লাহমুখী হওয়া। এটিই প্রকৃত তাকওয়া। এদিকে ইঙ্গিত করেই

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে, ‘তোমরা আল্লাহকে যথার্থরূপে ভয় করো।’ (সুরা আলে ইমরান: ১০২)

এটি তাকওয়ার সর্বোচ্চ স্তর। নবী-রাসুলগণ ও তাঁদের বিশেষ উত্তরাধিকারী সাহাবায়ে কেরাম, অলি-বুজুর্গগণ এ স্তরের তাকওয়া অর্জন করে থাকেন।

সমাজ জীবনে তাকওয়ার প্রভাব

সামাজিক জীবন দর্শনে তাকওয়ার গুরুত্ব অপরিসীম। তাকওয়ার পোশাক যারা আচ্ছাদিত তাদের কর্তৃক কোন রকম অন্যায় ও অসৎ কাজ হতে পারে না। অশ্লীলতা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজী, সুদ, ঘুষ, সম্পদ লুটপাট, কাউকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করণ, ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত-মুস্তাহাবরূপে নির্ধারিত হাক্কুল্লাহ (আল্লাহর অধিকার) ও হাক্কুল ইবাদ (মানুষের প্রতি মানুষের ও সৃষ্টিজগতের প্রতি মানুষের যাবতীয় দায়িত্ব-কর্তব্যসমূহ) পালন উদাসীন থাকা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে মুত্তাকীগণ জীবন যাপন করে। সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার পাশাপাশি দেশ ও জাতির উন্নয়নে গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে অবদান রাখতে সর্বদা সচেষ্ট থাকে। আল্লাহ্ তা‘আলা বলেন: “১৪] আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) বলেন: “তাকওয়া হচ্ছে নিজেকে অন্য যে কারোর তুলনায় উত্তম মনে না করা ।”

এ কথার অর্থ এ নয় যে, একজন মানুষ নিজেকে হীন, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ও অবহেলিত মনে করবে; বরং এ কথার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন তথা ব্যক্তি জীবন থেকে রাষ্টীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের যে বিধি-নিষেধ রয়েছে তা মানার ক্ষেত্রে সে ইবলিসের মত এ কথা বলবে না যে, “আমি তার [আদম (আ)] চেয়ে উত্তম-শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ।” অর্থাৎ সে অহংকারী হবে না।

কোন কোন মুফাসসির বলেন: “তাকওয়া হচ্ছে মহানবী (সা) এর অনুসরণ করা। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা’আলার বাণী ‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদল ও ইহসান.... এর নির্দেশ দিয়েছেন’ এই বাণীতে তাকওয়ার সমাবেশ রয়েছে ।”

অন্যত্র বলা হয়েছে:” আল্লাহ্ মুত্তাকীদের অভিভাবক-বন্ধু। “

তাকওয়া বা আন্তরিকতাবিহীন কোন কাজই সফলতা বয়ে আনে না। যে কোন কাজের প্রাণ হল তাকওয়া। বিশেষ করে ইবাদত হিসাবে যা কিছু করা হয় তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য তাকওয়া একান্ত প্রয়োজন। কারণ, “আল্লাহ কেবল মুত্তাকীদের কুরবানীই গ্রহণ করে থাকে।”

অন্যত্র বলা হয়েছে: “আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না এগুলোর (কুরবানীর পশুর) গোশত এবং রক্ত, বরং তাঁর কাছে পৌঁছায় তোমাদের তাকওয়া-মনের একাগ্রতা।”

মূলত তাকওয়ার গুণ অর্জনের জন্যই ইসলামের যাবতীয় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জসহ সকল মৌলিক কাজ অবশ্য পালনীয় করে দেয়া হয়েছে কেবল মানুষের মধ্যে সুপ্ত তাকওয়া গুণকে সমুন্নত করার জন্য। যে মানুষ যতবেশী তাকওয়ার অধিকারী হবে সে জাগতিক জীবনে সমাজে ততবেশী মর্যাদা ও সম্মানের যোগ্য হবে এবং পরকালে আল্লাহর কাছে বেশী সম্মনিত হবে।

আর কে কত বেশী মুত্তাকি তা নিয়ে আত্মপ্রশংসা করার কোন সুযোগ নেই। কেননা আল্লাহই ভাল জানেন কে কত বেশী মুত্তাকী।

যারা তাকওয়ার গুণ অর্জন করতে পারেন তারা আল্লাহর ভালবাসা লাভে ধন্য হন, আল্লাহ তাদের অতিবাহিত হয় বলে পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাযী (রা:) বলেছেন: মুত্তাকীর মর্যাদা বর্ণনায় “হুদাল লিল মুত্তাকীন” (পবিত্র কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথপ্রদর্শক) আয়াতাংশটি ছাড়া যদি আর একটি আয়াতও না থাকত তবে তাদের মর্যাদা বর্ণনায় এটিই যথেষ্ট ছিল। কারণ তাঁর মতে পবিত্র কুরআন মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

অন্য আয়াত: “আল-কুরআন হুদাল লিন নাস” অর্থাৎ‘পবিত্র কুরআন মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক। বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এটি সর্বজন বিদিত যে, কুরআন যার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর আহবান ছিল বিশ্বজনীন।

এতে বুঝা যাচ্ছে যে, সকল মানুষই মুত্তাকী তথা সবার মধ্যেই তাকওয়া রয়েছে। যার মধ্যে তাকওয়া নেই, সে যেন মানুষই নয়। যামাখশারী (রা:) আল্লাহর বাণী “অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তাকওয়া অবলম্বন কর এবং নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন কর এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা মু’মিন হও” এর ব্যাখ্যায় বলেন, এ আয়াতে মহান আল্লাহ্ তাকওয়া অবলম্বন, নিজেদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখা এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করাকে ঈমানের অপরিহার্য অংশ ও অবিচ্ছেদ্য দাবী বলে নির্ধারণ করেছেন।

সুতরাং তাকওয়া ছাড়া ঈমান পরিপূর্ণ নয়। আল্লাহর হক ও বান্দার হক উভয়টির মহত্ব ও গুরুত্ব বুঝানোর জন্য সূরা আন- নিসার প্রথম আয়াতটি শুরু করা হয়েছে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়ে এবং শেষও করা হয়েছে তাকওয়ার মাধ্যমে পরস্পরিক লেন-দেন সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়ে। সুতরাং মানুষের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রে তাকওয়া অবরম্বন করা।

তাকওয়ার মৌলিকত্ব বাহ্যিকতার চেয়ে ভিতরটায় সম্পৃক্ত বেশী। গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে মহান আল্লাহকে ভয় করার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং জীবনের সকল কর্মকাণ্ড তথা ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পূণ্য, ঠিক-বেঠিক, হালাল-হারাম যা-ই করুক না কেন তা লিপিবদ্ধকরার জন্য ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছে। ছোট-বড় কোন কিছুই তার খতিয়ানে লেখা থেকে বাদ যাচ্ছে না। এক সময় সে তার কৃত সমুদয় কর্মকান্ড স্বচক্ষে দেখতে পাবে। এই অনুভূতি নিয়ে জীবন পরিচালনা করাই হল তাকওয়ার দাবী। তাকওয়া বাহ্যিক আড়ম্বরতা ও লোকিকতার কোন স্থান নেই। "মানুষের বাহ্যিক অবয়ব এবং সম্পদের প্রতি আল্লাহ তাকান না; বরং তিনি দেখেন মানুষের কর্মকাণ্ড এবং মন-মানসিকতা।

মানব দেহের কোন স্থানে তাকওয়ার অবস্থান সে সম্পর্কে প্রিয় নবী (সা:)-এর সুস্পষ্ট বক্তব্য হল "তাকওয়া এখানে এবং তিনি তাঁর বুকের দিকে ইশারা করলেন।" অর্থাৎ যে মন বা অন্তকরণ মানুষের সকল কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি সেই মনের শুদ্ধতাই হচ্ছে তাকওয়া। কেননা মানব দেহের এ অংশটি সুস্থ থাকলে পুরো দেহই সুস্থ-স্বাভাবিক থাকে বলে হাদীসে প্রমাণ রয়েছে।

পরকালে মুত্তাকীগণই জান্নাত লাভে ধন্য হবেন। "মুত্তাকীগণ থাকবেন প্রস্রবণ-বহুল জান্নাত। তাঁদেরকে বলা হবে তোমরা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে তাতে প্রবেশ কর..."

তাকওয়ার ব্যক্তিগত , পারিবারিক ও সমাজ জীবনে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করে মানব মনে ইতিবাচক মুল্যবোধ সৃষ্টি করে এবং তাকওয়ার অভাব মানব জীবনকে অস্থির, নিরাপত্তাহীন, পঙ্কিল ও দুর্বিসহ করে তোলা। কেননা, উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায়, তাকওয়া শুধু আল্লাহ্ ভীতির মাধ্যেই সীমিত নয়; বরং সত্য সন্ধান, সত্য গ্রহণ, সত্যের উপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতির্ষ্ঠিত থাকা, আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করা, আল্লাহর ভয়ের ভিত্তিতে দায়িত্ব সচেতনতা ও দায়িত্ব সচেতনতার সাথে কর্তব্য সম্পাদনই হচেছ তাকওয়া।

অর্থাৎ মানব জীবনের সকল কর্মকান্ড ও তৎপরতাকে আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে পরিচালনা করা, আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করা, আল্লাহ্ কর্তৃক নিষিদ্ধ পথ ও পন্থা পরিহার করা এবং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র সৃষ্টিকূলের কল্যাণ কামনা করা, সর্বোপরি জবাবদিহিতামূলক সচেতনতার সাথে দায়িত্ব পালন করাই প্রকৃত তাকওয়া। তাই নানা সমস্যায় জর্জরিত মুসলিম জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাঙ্খিত কল্যাণ লাভের জন্য প্রয়োজন মানব

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাকওয়া অর্জন এবং তাকওয়ার ভিত্তিতে জীবন গঠন। আমাদের সমাজে যে দিন থেকে পূর্ণরূপ প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি হবে সেদিনই এ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ সমাজে শৃঙ্খলা ফিলে আসবে এবং সমাজ হবে সুখে-শান্তিতে সমৃদ্ধ, স্থিতিশীল ও প্রাণবন্ত।

মুসলিম মনীষীদের দৃষ্টিতে তাকওয়া ও মুত্তাকী

[১] আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা:) বলেন: "তাকওয়া হচ্ছে পাপ কাজে জড়িয়ে থাকাকে ছেড়ে দেয়া এবং সৎকাজে প্রতারিত হওয়াকে ছেড়ে দেয়া ।"

কুরআনের বাণী: "হে মানবসমাজ! তোমরা তোমাদের প্রভূর ইবাদত কর, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার।"

এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লামা কাযী নাসিরুদ্দীন বায়যাবী (রা:) বেলন: "এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তাকওয়া হচ্ছে আল্লাহর পথের পথিকদের সর্বশেষ স্তর। আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু থেকে মুক্ত হয়ে কেবল আল্লাহমুখী হয়ে জীবন যাপন করা এবং ইবাদতকারী যেন তার ইবাদত দ্বারা প্রতারিত না হয়; বরং সে ভয় ও আশা নিয়ে ইবাদত করবে।

যেমন আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র বলেছেন: "তারা তাদের প্রভূর ইবাদত করে ভয়ে ভয়ে ও আশায় আশায়। তারা তাঁর রহমতের প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে ।"

[২] উমর ইব্‌নু আবদুল আযীয (রা:) বলেন: "আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা ছেড়ে দেয়া এবং তিনি যা ফরয করেছেন তা আদায় করার নাম হচ্ছে তাকওয়া।"

[৩] আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) মুত্তাকীদের পরিচয় দিয়ে বলেন: "যারা মহান আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এমন সব কর্মকাণ্ড ছেড়ে দিয়ে, যেগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কিত বিধান আল্লাহর দেয়া হেদায়েত তথা কুরআন ও হাদীস থেকে তারা জানে এবং অনুসরণের জন্য মহনবী (সা) যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহ্‌র রহমত কামনা করে ।"

তিনি আরো বলেন: "যে ব্যক্তি নিজেকে শিরক, কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম ও কথাবার্তা থেকে বিরত রাখে, তাকে মুত্তাকী বলা হয়।"

[8] কালবী (রা:) বলেন: "যারা গুনাহে কবীরা তথা বড় ধরনের অপবাদ থেকে বেঁচে থাকে, তারা হল মুত্তাকী।"

[৫] হাসান (রা:) বলেন: "আল্লাহ্‌র ওপর আল্লাহ ব্যতীত কাউকে গ্রহণ না করা এবং সবকিছু তাঁর হাতে ন্যস্ত বলে জানা-এটিই হচ্ছে তাকওয়া।" তিনি আরও বলেন, "হারামের ভয়ে বহু হালালও যতক্ষণ মুত্তাকীগণ বর্জন করে চলেন ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকীদের মাঝে তাকওয়া বিদ্যমান থাকে।"

[৯] আবূ দারদা (রা.) বলেন: "সম্পূর্ণ তাকওয়া হল বান্দা আল্লাহকে ভয় করবে (করণীয় বিষয়) ত্যাগ করতে গিয়ে কিছু হালালও বর্জন করবে এই ভয়ে যেন তাকে হারামে পড়তে না হয়; আর যেন সামন্য হালাল বর্জন যেন হারাম এবং হালালের মাঝখানে পর্দা-দেয়াল হয়ে যায়।"

[১০] সুফইয়ান সাওরী (র.) বলেন: "যে বিষয়ে তোমর মনে সন্দেহ হয়, তা পরত্যাগ করার চেয়ে তাকওয়ার সহজ পথ আমার জানা নেই।" সুতরাং সন্দেহপূর্ণ যে কোন কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সবসময় নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করা হল তাকওয়া।

[১১] শাহর ইব্‌নু হাউশার (র) বলেন: "মুত্তাকী হচ্ছেন তিনি, যিনি এমন বিষয়-আশায়ও বর্জন করেন, যাতে কোন ক্ষতি নেই এই ভয়ে যাতে ক্ষতি আছে তা থেকে যেন বেঁচে থাক যায়।"

[১২] আতিয়া আল সাআদী (রা.) বলেন: "মুমিন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুত্তাকী বলে গণ্য হয় না যতক্ষণ না সে এমন বিষয়ও পরিত্যাগ নাকরে যা ক্ষতির কারণ হতে পারে।"

[১৩] ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) একবার উবাই ইব্‌নু কা'ব (রা)-কে বললেন: "আপনি তাকওয়া সম্পর্কে আমাকে বলুন। জবাবে তিনি বললেন, 'আপনি কি কখনও কন্টকাকীর্ণ পথ দিয়ে চলেছেন? ওমর (রা) বলেছেন, কাপড় চোপড় গুটিয়ে অত্যন্ত সাবধানে চলেছি। কা'ব (রা) বললেন, ওটাই তো তাকওয়া ।"

বস্তত: বিবেকের সার্বক্ষণিক সচেতনতা ও সতর্কতা, চেতনা ও অনুভূতির স্বচ্ছতা, নিরবচ্ছিন্ন সাবধানতা, জীবন পথের কন্টকসমূহ থেকে আ্ত্মরক্ষার প্রবণতা, অব্যাহত ভীতি-এ সবেরই নাম তাকওয়া। জীবন পথের কন্টকসমূহ হচ্ছে প্রবৃত্তির কুৎসিত কামনা, বাসনা ও প্ররোচনা। অন্যায় লোভ-লালসা, মোহ, ভয়-ভীতি ও শংকা, আশা পূরণে সক্ষম নয় এমন কারো কাছে মিথ্যা আশা পোষণ করা, ক্ষতি বা উপকার সাধনে সক্ষম নয় এমন কারো মিথ্যা ভয়ে আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি ।

১৪] আবদুল্লাহ ইবন ওমর (রা) বলেন: "তাকওয়া হচ্ছে নিজেকে অন্য যে কারোর তুলনায় উত্তম মনে না করা ।"

এ কথার অর্থ এ নয় যে, একজন মানুষ নিজেকে হীন, তুচ্ছ, নিকৃষ্ট ও অবহেলিত মনে করবে; বরং এ কথার প্রকৃত মর্ম হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালন তথা ব্যক্তি জীবন থেকে

রাষ্টীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের যে বিধি-নিষেধ রয়েছে তা মানার ক্ষেত্রে সে ইবলিসের মত এ কথা বলবে না যে, ‘‘আমি তার [আদম (আ)] চেয়ে উত্তম-শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন ।’’ অর্থাৎ সে অহংকারী হবে না।

[১৫] কোন কোন মুফাসসির বলেন: ‘‘তাকওয়া হচ্ছে মহানবী (সা) এর অনুসরণ করা। কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ তা’আলার বাণী ‘‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদল ও ইহসান.... এর নির্দেশ দিয়েছেন’ এই বাণীতে তাকওয়ার সমাবেশ রয়েছে ।’’

উপসংহার:

তাকওয়ার একটি চিরন্তন যাত্রা

তাকওয়া শুধু একটি শব্দ নয়, এটি একজন মুসলমানের জীবনের মূল ভিত্তি। আল্লাহভীতি, পরহেজগারি, সর্বদা সতর্ক থাকা – এ সব মিলেই তাকওয়া।

তাকওয়ার কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্য নেই, এটি একটি চিরন্তন যাত্রা। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করে, তাঁর হুকুম-আহকাম মেনে চলে এই যাত্রা চলতে থাকে।

* আল্লাহর সন্তুষ্টি: তাকওয়া অর্জনের মূল লক্ষ্য হল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা।
* পরকালের সফলতা: তাকওয়ালু ব্যক্তিদের জন্য পরকালে সুখ ও শান্তি নিশ্চিত।
* দুনিয়ার কল্যাণ: তাকওয়া মানুষকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে, যা সমাজের জন্য উপকারী।
* আত্মিক শান্তি: তাকওয়া মানুষকে আত্মিক শান্তি ও স্বস্তি দান করে।

তাকওয়া জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য। এটি শুধু ধর্মীয় বিষয় নয়, বরং জীবনের সকল দিককে স্পর্শ করে। তাকওয়া অর্জনের জন্য সারাজীবন চেষ্টা করে যেতে হবে।

Reference

১. আল কুরআন

২. তাফসীরে ইবনে কাসীর- ইবনে কাসীর

৩. তাকওয়া- আমির জামান নাজমা জামান

৪. তাকওয়া মুমিনের সমৃদ্ধি (সন্দীপন প্রকাশনী)

৫. তাকওয়া মুমিনের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন – ড. উমর সুলাইমান আসকার রহিমুল্লাহ

৬.তওবা ও তাকওয়া

৭. তাকওয়ার মহত্ত্ব

৮. উপদেশ – আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ

৯. মুহাম্মদ আল আস-সাবুনী, রাওয়ায়িউল কায়ান তাফসীর আয়াত আল আহকাম নিম আল কুরআন, সৌদি আরব, খণ্ড ১. পৃ,৪১৯।

১০. মাহমূদ ইবন উমার আল যামাখশারী, আল-কাশ্‌শাফ আন হাক্বায়িক্বি আল তানযীল ওয়া উয়ূনি আল আক্বাবীল ফী ওযূহি আল তাবীল, প্রাগুক্ত, খণ্ড ১, পৃ. ১৯৫।

১১. মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহ) অনুবাদ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, তাফসীর মাআরেফুল কোরআন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১।

১২. কাযী নাসির উদ্দীন আবদুল্লাহ্ ইবন ওমর ইবন মুহাম্মদ আল-বায়যাবী।

১৩. কাবীরুল ইসলাম, মুহাম্মাদ (নভেম্বর ২০১৩)। *তাক্বওয়া (আল্লাহভীতি)* (পিডিএফ)

১৪. আবদুর-রহমান, মুহাম্মদ সাঈদ (২০০৯)। *মহিমান্বিত কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা*। এমএসএ পাব্লিকেশন লিমিটেড।

১৫. তাকওয়া : এক মহিমান্বিত গুণ - মাসিক আলকাউসার"। *আল-কাউসার*।

১৬. তাকওয়া মুমিনের সম্বল- ইমাম ইবনে কাইয়িম (র)